রোদ্দরে সোনার রং

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

এস দাশ এণ্ড কো:
৩৭/৬, বেনিয়াটোলা লেন· কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৪

প্রকাশক :
সুরেশ দাশ
৩৭/৬ বেনিয়া টোলা লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
রাজেন চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
সোমা প্রকাশন
২এ, কেদার দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

॥ সমীরকুমার নিয়োগী

স্মৃতিভাজনেষু ॥

মাত্র বারোটি মাস। এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল শ্রীলার জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। আর কোনদিন ওর তৃষ্ণাকে ঘিরে খেলা করবে না হাজার রাতের কামনার স্বপ্ন। ওর আকাঙ্খার কুঁড়িগুলি আর দল মেলবে না প্রিয়জন অনুরাগে। তৃষিত চেতনাকে ঘিরে দুচোখে নামবে না আতুর তন্দ্রা। দীর্ঘকাল ধরে লালন করা নিভৃত বাসনার দিনগুলি মাত্র এক বছরেই ফুরিয়ে গেল।

অথচ ঠিক এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। কথা ছিল না, এই সুরভিত দিনগুলির চৈত্রের ঘুর্ণি হাওয়ায় শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ার। মুক্তির সীমানায় দাঁড়িয়ে সেই কথাই ভাবল শ্রীলা :

: এখন শ্রীলা একা। এখন শ্রীলার দিনগুলি বৈচিত্র্যহীনতায় মন্থর। আকাশ ছোঁয়া ইমারতগুলোর আড়ালে এক চিলতে আকাশ দেখল শ্রীলা। দেখল আকাশে মেঘ নেই। সেদিনও ছিল না, কিন্তু শ্রীলা ভাবল, আজকের আকাশে সেদিনকার সেই নীল নির্বেদ প্রশান্তি নেই। কেমন যেন ঘোলাটে। ঘষা কাঁচের মত। মুক্তির আনন্দে শ্রীলার মন সাড়া দিচ্ছে না। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা বেদনার কাঁটা শির-শির করছে। বারোটি মাসের অনেক আনন্দ মেশানো স্মৃতিগুলো যেন দুঃস্বপ্নের ছায়ামানুষের মত তাড়া করে শ্রীলাকে। শ্রীলা ভুলতে চায়। শ্রীলা সব কিছু ভুলে যেতে চায়। ভুলে যেতে চায় বারো মাসের এই খণ্ডিত জীবনটাকে। আর সেই মানুষটিকেও। মানুষ নয়, একটা দুর্ণিবার প্রলোভনের হাতছানি দেওয়া বিষাক্ত মন, নিখিলেশ যার নাম।

মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত-বিক্ষত হয় শ্রীলা। সব স্মৃতি মুছে ফেলা যায় না। সব দাগ ধুয়ে ফেলা যায় না। সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছে শ্রীলা। অনেক কষ্টে সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলেছে একটা মূর্তিমান দুরভিসন্ধির স্বাক্ষর। কিন্তু তবু, মনের

মধ্যে সেই ছায়া-ছায়া দুঃস্বপ্নগুলোর অনুশাসন অহরহ অনুভব করে। একদা যার দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্খা সীমন্তে ধারণ করেছিল শ্রীলা, সেই প্রতারণা ও দুর্বার লোভের হাতছানি দেওয়া মানুষটির নাম নিখিলেশ।

কিন্তু এই মুক্তি তো নিঃশুল্ক নয়, শ্রীলা ভাবলো, এবং পর মুহূর্তে সেই দুঃস্বপ্নের ছায়ামানুষগুলোর নিঃশব্দ পদ সঞ্চার অনুভব করলো। মনের ভিতরে একটা শক্তিশালী অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল শ্রীলা। শ্রীলা অত্যন্ত অসহায় বোধ করছিল এবং ওর সমস্ত ইচ্ছার সাহসকে কণ্ঠ বোধ করে সিনেমার ফেড্ ইন্ ছবির মত মহানগরার ইমারতগুলোর গায়ে ফুটে উঠল সেই উন্মুখ মুহূর্তের স্মৃতিগুলি। শ্রীলা চোখ বুজল। কিন্তু মনের পর্দাতে সেই একই দৃশ্য দেখল ও। প্রাণপণ চেষ্টা করে শ্রীলা ভাবল আজই , এবং আর নয়। কারণ, শ্রীলার জীবনে নিখিলেশ নামটির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই শেষ বারের মত শ্রীলা চোখ বুজে কলকাতার আকাশে দার্জিলিংএর সন্ধ্যাকে প্রত্যক্ষ করল। যে প্রবঞ্চক সন্ধ্যা ওকে সব কিছু দেবার আশ্বাস দিয়েও সব কিছুই কেড়ে নিয়েছে।

* * * *

তখন কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারের সঙ্গে হোলী খেলে মাতাল সূর্য সবে বিদায় নিয়েছে। অস্ত শেষের লালিমা তখনও লুকোচুরি খেলছে শৃঙ্গে শৃঙ্গে। পাইন আর পপলারের আড়ালে পাহাড়তলীর সব বাড়ীগুলো আধো আলো আধো অন্ধকারে ছায়াম্লান। জলা পাহাড় থেকে ম্যালের দিকে ফিরে আসছে নবীন ঘোড় সওয়ার। সন্ধ্যার দার্জিলিংএর প্রজাপতি রঙ্গ। শৈল নগরীর স্নায়ুকেন্দ্র ম্যালের তরতাজা যুবতীর বেশ। চাঞ্চল্য আছে, ব্যস্ততা নেই অবজারভেটরীর রাস্তায়, বটানিক্স্এ ভ্রমনার্থীর ভীড়। বার্চ্চহীল থেকে ফেরার পথে গোমেধ কেনার কথাটা মনে পড়ল শ্রীলার।

আসবার সময়ে জিজ্ঞেস করেছিল শ্রীলা, আর তোমার জন্য কি আনব বলো ?

ইতিহাসের অধ্যাপক ব্রজবিলাস মিত্র তন্ময় হয়ে পড়ছিলেন আকবর বাদশার সময়ে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিবরণ, ভূমি রাজস্ব সম্বন্ধে রাজা তোডরমলের অবদান ইত্যাদি। কোন পূর্বাভাস-বিহীন প্রশ্নে অবাক হয়ে শ্রীলার দিকে তাকালেন।

তুমি যেন কি জিজ্ঞাস করছিলে ?

শ্রীলা মৃদু হেসে বলল, দার্জিলিং থেকে তুমি যে কিছু আনতে বললে না ?

ব্রজবিলাস মাথা চুলকে বললেন, তা কে যাচ্ছে, কবে যাচ্ছে ?

শ্রীলা আকাশ থেকে পড়ল। সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে বলল, তুমি যেন কি! শ্রীলার কণ্ঠে ক্ষোভ, কে দার্জিলিং যাচ্ছে তুমি বুঝি জানো না ?

স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন ব্রজবিলাস। কে যাচ্ছে, সুনীত ? সুধন্য ? একটু রাগও হল ব্রজবিলাসের। আশ্চর্য, এরা কোথাও গেলে তাঁকে একবার জানানোর প্রয়োজন বোধ করে না ? অতএব ব্রজবিলাস রুষ্ট হলেন রীতিমত।

সে ভাব লক্ষ্য করে শ্রীলা খিল খিল করে হেসে উঠল।—যাচ্ছি আমি. এবং আজই সন্ধ্যায়, দার্জিলিং মেলে। আর অনুমতি নেওয়ার কথা ভাবছ ? ট্রাভলার্স চেকখানা তুমি কাল কিসের জন্য দিলে ?

সব মনে পড়ে গেল ব্রজবিলাসের। বাস্তবিকই ভুল হয়ে গেছে। ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে ব্রজবিলাস বললেন আকবর বাদশা আর তোডর-মল আমাকে ভারী জ্বালাচ্ছে জানো। সব কিছু ভুলে যাই। তা তুমি তো ইয়োথ এ্যাসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে যাচ্ছ দার্জিলিংএ। মনে পড়েছে। তা তুমি যেন কি বলেছিলে ?

তোমাকে নিয়ে আর পারিনে, শ্রীলা অধৈর্য্য। দার্জিলিং-এ তোমার কোন ফরমায়েস নেই ?

তা ওরা কে কি বললে ?

ওরা মানে কারা ?

এই মনিকা, শম্পা, বুলবুল, মেজ বৌমা।

মনিকার জন্য আগেল পাথরের মালা, শম্পার জন্য গোল ষ্টোন আর বুলবুলের জন্য টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের ছবি। কিন্তু তোমার কি চাই বল, টোব্যাকো পাইপ ? ওয়াকিং ষ্টিক ?

না না, ওসব তো রয়েছেই। তুমি বরং একটা গোমেধ কিনে এনো।

ম্যালে দাঁড়িয়ে সে সব কথা মনে পড়ল শ্রীলার। এভারেষ্ট কিউরিওতে তখনও খদ্দেরদের ভীড় জমেনি। কাউনটারে একজন ভদ্রলোক কতকগুলো পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। শ্রীলা সোজাসুজি এগিয়ে গিয়ে সেলস কাউনটারের সুবেশ তরুণটিকে জিজ্ঞাস করল 'গোমেধ পাওয়া যাবে ?' ভদ্রলোক পার্শি, অমায়িক হাসি হেসে বললেন, দুঃখিত, গোমেধের ষ্টক শেষ হয়ে গেল এই মাত্র। অন্য কিছুতে আগ্রহ থাকলে দেখাতে পারি এবং শ্রীলার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে একটা ভেলভেটের সুদৃশ্য ষ্টোন কেস মেলে ধরলেন, ক্যাটস আই, পোখরাজ, মুনষ্টোন ?

ধন্যবাদ, হতাশ কণ্ঠে শ্রীলা বল্ল, আমার গোমেধেরই প্রয়োজন।

পার্শি ভদ্রলোকের মুখে ম্লানিমার ছায়া নামল। শ্রীলাকে গোমেধ দিতে না পেরে ভদ্রলোক যেন শ্রীলার চেয়েও বেশি হতাশ হলেন। দুঃখিত স্বরে বললেন, আপনাকে ফিরিয়ে দিতে বাস্তবিকই আমি কষ্ট বোধ করছি। পাঁচ মিনিট আগে এলে হয়ত আপনার মত কাষ্টমারকে আমি খুশী করতে পারতাম।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে শ্রীলা আরো জিজ্ঞাসা করল ভদ্রলোককে, —আচ্ছা, অন্য কোন দোকানে পাওয়া যেতে পারে কি ?

বোধ হয় না। ভদ্রলোক বললেন, আসল গোমেধের ষ্টক একমাত্র আমরাই রাখি।

এবং শ্রীলা বেরিয়েই আসছিল। গোমেধটা না পাওয়াতে মনটা ভারী হয়ে উঠেছিল শ্রীলার।

পাওয়াটা বড় কথা নয়, ব্রজবিলাসের পছন্দ মাফিক একটা জিনিস নিয়ে যেতে না পারার দুঃখটাই বেশি।

পথে পা দিয়েছিল শ্রীলা। সহসা পিছন থেকে কে যেন ডাকল, শুনুন।

থমকে দাঁড়াল শ্রীলা। এভাবেই কিউরিওতে যিনি একমনে পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন তিনিই। ভদ্রলোক নিখুঁত সাহেবী পোষাকে সজ্জিত। কোবাল্ট ব্লু সার্জের স্যুট। লাল টাইএর উপর সাদা সুতোর এম্ব্রয়ডারী করা এক ঝাঁক পায়রা যেন বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

গোমেধ আপনার প্রয়োজন? ভদ্রলোক সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন।

ঘাড় নাড়ল শ্রীলা।

তাহলে তো এটা আপনারই পাওয়া দরকার। ডান হাতে তালুতে একটা পাথর মেলে ধরলেন ভদ্রলোক।

এভাবেই কিউরিওর শেষ গোমেধটি আমিই কিনেছি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, পাথরটা আমি স্পেয়ার করতে পারি।

শ্রীলা বিব্রত বোধ করল। সেটুকু লক্ষ্য করে ভদ্রলোক বললেন, না ঝুটো পাথর নয়, বিশ্বাস না হলে কিউরিওর মালিকদের জিজ্ঞেস করুন।

না না, সে কথা নয়, শ্রীলা বলল, আপনি যখন সখ করে কিনেছেন।

দেখুন এতে আপনার দ্বিধার কোন কারণ নেই। ভদ্রলোক বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। এবং এটা

আপনাকে আমি প্রেজেন্ট করতেও চাইছি না। আপনার প্রয়োজন হয়ত আমার চেয়েও বেশি, শুধু এই ভেবেই যে দামে কিনেছি সেই দামেই বিক্রী করে দিচ্ছি, ইচ্ছে হলে আপনি নিতে পারেন।

মাফ করবেন। কার প্রয়োজনটা বেশি, এটা আমাদের দুজনারই অজানা, কাজেই আপনার সখ করে কেনা জিনিস—

বিশ্বাস করুন, গোমেধে আমার বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ নেই। নিতান্তই সখ করে একটা পাথর কিনতে এসেছিলাম। সে সখ একটা ক্যাটস্ আই বা পোখরাজ কিনেও মিটতে পারে। কিন্তু আপনার প্রয়োজন বিশেষ করে গোমেধের। আপনি যদি আমার কাছ থেকে নিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, আমি না হয় কিউরিওতেই ফেরৎ দিচ্ছি আপনি সেখান থেকে কিনে নিন।

সব সঙ্কোচ ও দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে শ্রীলা বলল, তার প্রয়োজন হবে না। আপনার কাছ থেকেই নেব।

ভদ্রলোক খুশী হলেন। ব্যাগ থেকে টাকা বের করে দাম মিটিয়ে দিয়ে শ্রীলা বলল, আপনার সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, আপনি আমাকে লজ্জিত করছেন।

এবার শ্রীলাও হাসল।

আচ্ছা, চলি, নমস্কার। কিউরিও থেকে নিষ্ক্রান্ত হল শ্রীলা। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কিউরিওর মালিক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন **Any other stone gentleman ?**

No, thanks.

ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

পরিচয় নয়। এটা পরিচয়ের ভূমিকা। কারণ শ্রীলা ভাবেনি, আবার দেখা হবে দুজনার। ভাবেনি, সেই ক্ষণিকের আলাপিতের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হবে কোনদিন। ঘনিষ্ঠতার সীমা ছাড়িয়ে রূপান্তরিত হবে অন্তরঙ্গতায়। ভেবেছিল, একটি আকস্মিক উপকারের

মধুর স্মৃতি দীর্ঘকাল ধরে তার হৃদয়কে মনোরম সৌরভে সুবাসিত করে রাখবে। কোন অলস অবকাশের মুহূর্তে দার্জিলিং-এর স্মৃতিগুলো যখন মনের মাঝে চঞ্চল প্রজাপতির মত খেলা করবে, তখন হয়ত একটি উদার উপকারের কথা তার চেতনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে। হৃদয় হয়ত অকারণে চঞ্চল হবে। কি যেন তার নাম, কি যেন— অথচ শ্রীলা তার নামটাও জানে না।

এবং নিখিলেশও ভাবেনি। নিখিলেশও ভাবেনি দার্জিলিং এর আরও কয়েকটি সন্ধ্যা মধুর হবে শ্রীলার অনুপম সাহচর্যে। মনের সরোবরে প্রেমের পদ্ম পাপড়ি মেলবে হৃদয়ের অনুরাগে। অনেক আবেগ বিহ্বল আলাপনে ভিক্টোরিয়া ফল্‌সের ফেনিল জলধারা হয়ত বা মুহূর্তের জন্যও কেঁপে উঠবে। হয়ত বা টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের বর্ণালী দুটি হৃদয়কে সমান ভাবে রাঙিয়ে দেবে। তাই শ্রীলার সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনের বেঞ্চে আবার দেখা হল নিখিলেশের। তখন কুয়াশার ঘোমটা পরে সন্ধ্যা নামছে দার্জিলিং-এ। মুঠো মুঠো কুয়াশা যেন ঝরে পড়ছে ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায়। ভ্রমণার্থীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। নানা বেশ, নানা রঙ্গ। শ্রীলা একটা ওক্ গাছের নীচে বেঞ্চে বসেছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার তার দীপ্তি হারিয়েছে সন্ধ্যার ছায়ায়। দার্জিলিং-এর কুয়াশা আজ অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি। পাইন আর পপলার যেন কুয়াশার কাছে হার মেনে দীন নয়নে তাকিয়ে আছে পরাজিত সৈনিকের মত।

শ্রীলাকে নিখিলেশ আগেই দেখেছিল। কিন্তু ইচ্ছে করেই কাছে যায়নি। জীবনের নেপথ্যে আর আলাপিতের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি? পথের পরিচয় তো পথেই শেষ হবে। দীর্ঘ যাত্রাপথে ওয়েটিং রুমের সহযাত্রীকে কেই বা মনে রাখে?

শ্রীলাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল নিখিলেশ। ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীলাও বেঞ্চ ছেড়ে উঠল। নিখিলেশ যদি চলে যাবার চেষ্টা

না করে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকত তাহলে হয়ত শ্রীলার সঙ্গে দেখা হত না।

কিন্তু শেষপর্যন্ত বেরুবার মুখে, গেটের কাছেই দেখা হল দুজনার। শ্রীলা নিখিলেশের দিকে তাকাল। এবং নিখিলেশও।

শ্রীলা। বেড়াতে বেরিয়েছেন ?

নিখিলেশ। হ্যাঁ।

শ্রীলা। কোথায় উঠেছেন ? স্নো ভিউ ? স্যানটোরিয়াম ?

নিখিলেশ। না, হোটেলে নয়, সার্কিট হাউসে উঠেছি আমি।

সার্কিট হাউসে ? শ্রীলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত।

সেমিনারে মন্ত্রীদের ল্যাংবোট হয়ে এলে সরকারী মুসাফিরখানায় না উঠে উপায় কি বলুন ? লজ্জিত ভাবে হাসল নিখিলেশ। দার্জিলিং-এর দামাল বাতাসে হিল্লোলিত হল ওর সাদার কারুকার্য করা লাল টাই, আর শ্রীলার কয়েকগাছি চুল উড়তে লাগল।

অনাবশ্যক কৌতুহলে আকুলিত হয়ে জিগ্যেস করল না শ্রীলা, কি চাকরী করেন, এম্বাসীতে না সেক্রেটারীয়েটে। অথবা নিবাস কোথায় দিল্লী কিংবা দেরাদুন। ম্যালের কাছাকাছি এসে নিখিলেশ বলল শুধু, চলুন না, ওই বেঞ্চটায় কিছুক্ষণ বসা যাক।

একটা বেঞ্চে বসল ওরা। হিমেল বাতাস বইছে। পাইনের শাখায় শাখায় শিহরণ। কালো জমির ওপর লাল বুটিদার শালটা ভাল করে জড়িয়ে নিল শ্রীলা একটা সিগারেট ধরাল নিখিলেশ। সন্ধ্যা ঘনায়নি এখনও। হিমালয়ের মেঘ জমেছে ধবলগিরির চূড়ায়। আকাশের সঙ্গে পাহাড়ের সীমারেখার কন্দরগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। মেঘ আর কুয়াশার কোলে সমস্ত দার্জিলিং যেন শিশুর মত দোল খাচ্ছে।

দার্জিলিং-এর সন্ধ্যা ভারী সুন্দর, তাই না ? শ্রীলা বলল।

এবং, নিখিলেশ কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

কি ? শ্রীলা শুধোল।

না, থাক, নিখিলেশ বলল।

থাক কেন, বলুন না।

সেকথা বলা শোভন হবে কিনা ভাবছি। কিন্তু কথাটা অত্যন্ত সহজ ভাবেই আমার মনে এসেছিল।

তাহলে নিঃসঙ্কোচে বলুন।

অভয় দিচ্ছেন?

নির্ভয়ে বলুন।

দার্জিলিং-এর সন্ধ্যা তাদের কাছে অনেক বেশি মনোরম যাদের পাশে আপনার মত বন্ধু রয়েছেন।

শ্রীলা খিল খিল করে হেসে উঠল। দার্জিলিং-এর বাতাসে তুষার ঝরল এক রাশ।

এই কথা বলার জন্য এত দ্বিধা, এত সঙ্কোচ।

দ্বিধা নয়। ভরসা পাচ্ছিলাম না।

ক'দিন থাকবেন এখানে?

সেমিনার শেষ হলেই চলে যাব। আপনি?

বেড়ানো শেষ হলেই। শ্রীলা বলল, কিন্তু যাওয়ার আগে একটা বাসনা আছে। দার্জিলিং-এর শেষ ইচ্ছে।

শ্রীলার কথাটা পুরোপুরি অনুধাবন করতে না পেরে নিখিলেশ ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, শেষ ইচ্ছে?

এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজীংনোরগের পাশে দাঁড়িয়ে একখানা ছবি তোলাবার।

নিখিলেশ আশ্বস্ত হ'য়ে কণ্ঠে একটু কৌতুকের সুর মিশিয়ে বলল, তেনজীং ভাগ্যবান।

কেন? ভ্রূ তুলে শ্রীলা বলল।

না, এমনি।

ওঃ। অর্থ টা বুঝতে শ্রীলা হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল

আপনার কথা শুনে গৌরবান্বিত বোধ করা উচিত। কিন্তু ভাবছি কথাটা কতখানি সত্যি।

গোটাটাই। কিন্তু আপনি উঠেছেন কোথায়? আন্তরিকতার সঙ্গে নিখিলেশ শুধোল।

ধীরধাম টেম্পল-এর কাছে। হোটেলের নাম তুষার-মায়া।

চমৎকার নাম।

শ্রীলা হাসল।

আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি খুব ভাল লাগছে। নিখিলেশ হঠাৎ বলল।

এতক্ষণে? ওটা তো আলাপের প্রথম কথা।

বিলিতি কায়দায়। খুশি হন বা অখুশি, বলতেই হবে। আমি কিন্তু খাঁটী বাঙ্গালী প্রথায় পরিচয়ের মধ্যপথে বললাম। এবং যথার্থ খুশি হয়েই।

আমরা কিন্তু কেউ কারো নাম জানিনা।

আমার নাম নিখিলেশ গুপ্ত।

আমি শ্রীলা। শ্রীলা মিত্র।

নিবাস কলকাতা?

হ্যাঁ। আপনার।

একদা লক্ষ্ণৌ। এখন দিল্লী।

ম্যাল ফাঁকা হয়ে আসছে। কিউরিও আর ফটোগ্রাফীর দোকান-গুলো বন্ধ হচ্ছে ধীরে ধীরে। ঘোড়াগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আস্তাবলে। গ্লীনার্স হোটেলে নাচের বাজনা বাজছে।

এবার ওঠা যাক। শ্রীলা বলল।

আপনি পথ চিনে যেতে পারবেন? নিখিলেশ শুধোল।

দার্জিলিং এর পথ এত ঘোরালো নয়। হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। চলুন খানিকটা এগিয়ে দিই। শ্রীলা বুঝল নিখিলেশ ওর সাহচর্য চায়, অন্ততঃ আরও কিছুক্ষণ।

নিখিলেশও ভাবছিল সেই কথা। অলস সময়ের আরও কয়েকটি মুহূর্ত্ত নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততায় কাটবে। অখণ্ড অবসর নিখিলেশের। কয়েকটা উঁচু নীচু পথের দূরত্ব পার হয়ে ষ্টেশনের কাছে তুষারমায়া হোটেলে পৌঁছাল ওরা।

ধন্যবাদ, শ্রীলা বলল, পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গী পাশে থাকার একটা আলাদা আনন্দ আছে। তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলাম না।

হঠাৎ যেন দপ করে জ্বলে উঠলো নিখিলেশ। সেতারের সাতটি তার যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল মনের মধ্যে। দার্জ্জিলিংএর পাইন আর পপলারের শিহর যেন হৃদয়ময় ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু থাক। আর না। আর ভুলের হিমালয় রচনা করবে না নিখিলেশ। নিজের দুঃখ ব্যথার সঙ্গে অপরেব জীবনকে এমন ভাবে জড়িয়ে একটা বেদনার সুর পাইনের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিতে চায় না আর।

ললিতা তখন ঘষে ঘষে ক্রীম লাগাচ্ছিল মুখে। আপাদমস্তক র‍্যাগ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল শ্রীলা।

ওরা দুজন একসঙ্গে এসেছে।

তাহলে উর্ম্মিলাদির দেওরের কপাল মন্দ। ললিতা বলল।

মানে ?

ললিতা নির্লিপ্ত ভাবে বলল, তোর নবলব্ধ বন্ধু সম্বন্ধে তুই যে পরিমাণ উচ্ছ্বসিত, তাতে মনে হয় উর্ম্মিলাদির দেওর বেচারী ক্লীন বোল্ড আউট !

কি যে বলিস। পাশ ফিরে শোয় শ্রীলা। তাকে তো চোখেই দেখিনি এখনও।

ললিতা খিল খিল করে হেসে উঠল, শুধু বাঁশী শুনেছিস। শুনেছিস তার রুচি, পছন্দ এবং অহঙ্কারের কথা।

মানুষকে চোখে না দেখলে কি তার বিচার করা যায় ?

ললিতার মুখে ছায়া নামল হঠাৎ। চোখে দেখা মানেই আলাপ

করা, এবং আলাপ সাঙ্গ হলেই চেখে দেখার অভিপ্রায়। তুই দিনদিন ভারী ভাল্‌গার হয়ে পড়ছিস।

সে তুই যাই বল, আমি কিন্তু সত্যি কথাই বলেছি। তাই আমার মনে হয়, বিয়ের আগে প্রেমের চেয়ে বিয়ের পরে প্রেম অনেক নিরাপদ। অন্ততঃ তাতে নিশ্চিন্ততার আশ্বাস আছে। বিয়ের আগে প্রেম যেন নিতান্তই দেনা পাওনা, লাভ লোকসানের হিসেব।

শ্রীলা মনে মনে ললিতার দুঃখ অনুভব করল। তারপর বলল, তুই আজকাল অত্যন্ত সিনিক হয়ে পড়েছিস ললিতা।

ললিতা হট ওয়াটার ব্যাগটা কোলের ওপর আয়েস করে চেপে বলল মানুষ সিনিক হয়ে জন্মায় না শ্রীলা। দুনিয়ার হাল-চাল দেখে সিনিক হয়। কিন্তু ওকথা যাক। তুই তোর নতুন বন্ধুর কথা বল।

শ্রীলা বলল, ভদ্রলোক চমৎকার।

ললিতা বলল অর্থাৎ চমৎকার ভদ্রলোক। কিন্তু ভদ্রলোকের সংখ্যা তো কমে আসছে ধীরে ধীরে। একদিন হয়ত এক্সটিংট হয়ে যাবে। ডাইনোসারাস, টেরোডাক্টাইলের মত।

তামাশা করছিস?

না, তামাশা নয়। তোর চেয়ে আমি ঢের বেশি মিশেছি পুরুষ মানুষদের সঙ্গে। ওদের মধ্যে পুরুষ আছে, কিন্তু মানুষ নেই। আর ভদ্রলোক তো দূর অস্ত। তাই তোর কথা শুনে খানিকটা অবাক হলাম।

শ্রীলা বুঝল, এটা ললিতার ক্ষোভের কথা, দুঃখের কথা। শ্রীলা জানে ললিতার দুঃখের কারণ। ব্যথার উৎস। তবুও, একটা হঠাৎ খুশির দুঃসাহসে শ্রীলা বলল, নিজের দুঃখ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলে দুঃখ পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে, ললিতা।

আমি তা জানি শ্রীলা। তাই মনটাকে ফুলের ঢাকনা দিয়ে আড়াল করে রেখেছি যেন কেউ তার আঁচ না পায়। কিন্তু পারি কই? কতজনের সঙ্গে মিশলাম, কতজনকে দূর থেকে দেখলাম,

কতজনের কাছে এলাম। কিন্তু আশ্চর্য, সবাইকার চোখের ভাষা এক। সবাই শুধু নিজের পাওনাটাই বুঝে নিতে চায়, দিতে চায় না কিছু। চোখে সেই বিশ্বামিত্রের কাঙাল পণা। কিন্তু দরদীর মত কাছে এসে, একটু অভিমান, একটু উত্তাপ, একটু মিনতি নিয়ে কেউ তো বলে না, হে বন্ধু আছ তো ভালো ? আমি হেরে গেছি শ্রীলা, নিজের কাছে। অন্যের কাছেও।

ললিতার নেপথ্যজীবনে ও একা, ও অসহায়। সেখানে ওর দুঃখে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। ওর বেদনার সমব্যথী কেউ নেই। তবু, বাইরে একটা খুশিয়ালীর নির্মোকে চেপে রাখে ওর দুঃখকে। সে দুঃখ ওর মনের মধ্যে অহরহ কুশের মত বিঁধে ওকে ক্ষত বিক্ষত করে।

বাইরে আলোকোজ্জ্বল দার্জিলিং কুয়াশার মাঝে অবলুপ্ত। ভিতরে এই শীতার্ত্ত চার দেওয়ালের সখীসংবাদের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যথার প্রচ্ছন্ন সুর ছিল যা পীড়িত করছিল দুজনকেই। মনের গভীরে একটা মৃদু ব্যথা যেন টনটন করছিল এবং দুজনাই অনুভব করছিল রাত্রির এই আশ্চর্য মায়ায় বুঝি বা দুজনেই নিজেদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অতল সমুদ্রে তলিয়ে যাবে !

সেই আচ্ছন্ন চেতনার মাঝে ললিতা পুনরায় বলল, কারো সহৃদয়তায় আজ বিশ্বাস হয় না। মাঝে মাঝে নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারি না। মনে হয় জীবনটা ঘোর মিছে। একটা দুর্বিষহ আত্মপ্রবঞ্চনা। আমার নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে এই অনুভব আমাকে অক্টোপাসের মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। মনে হয় দিনগুলো ভয়ঙ্কর শূন্য হয়ে গেছে। মনে হয় পৃথিবী বুঝি তার সব রঙ্গ হারিয়ে ফেলেছে, বাতাস বুঝি থেমে গেছে। আমি পারি না। সেই দুঃসহ মুহূর্তে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তখন, আমার মনে হয়, আমার মনে হয়,…

জানালার শার্সিতে তুষার জমছে। আবছা হয়ে আসছে ধীরধাম

মন্দিরের শীর্ষ। আর একটু পরেই অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে যাবে শহর দার্জিলিং। শুধু অসমতল ভূমির ওপর ইতস্ততঃ ছড়ানো কতকগুলো আলোক বিন্দু জেগে থাকবে সীমাহীন সমুদ্রের বুকে অতন্দ্র লাইটহাউসের মত।

দার্জিলিং-এর সকাল কলহান্তরিতার মত বিধুর। তুষার আর কুয়াশার ঘোমটায় ঢাকা অভিমানিনী বধূর মত। কুয়াশা যখন কেটে যায়, কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষ থেকে সরে যায় মেঘের আস্তরণ, পাইনের সারি উতলা হাওয়ায় মাথা দোলায়, তখন মুক্তির আনন্দে কয়েক মুহূর্তের জন্য ঝলমলিয়ে ওঠে সোনালী সকাল।

তখন তুষার মায়ায় চায়ের টেবিলও মুখর হয়ে ওঠে। এটা ঠিক পুরোপুরি হোটেল নয়। সীজন্যাল হোটেল বলা যেতে পারে। দার্জিলিং-এ যখন ভ্রমণার্থীদের মরশুম শুধু মাত্র সেই সময়টুকুর জন্য। কাজেই খানিকটা বাড়ীর আয়েসও পাওয়া যায়। তেতলায় থাকেন হোটেলের মালিক ইন্দ্রজিত সিং সপরিবারে। দোতলার সব কামরাগুলো হোটেলের আবাসিকদের জন্য। নীচে লাউঞ্জ, ডাইনিং হল, অফিস ইত্যাদি। চায়ের টেবিলের পাশেই ফায়ার প্লেস। চায়ের টেবিলকে ঘিরে বসেছিল শ্রীলা, ললিতা, সস্ত্রীক ইন্দ্রজিত সিং, ইন্দ্রজিৎ সিং-এর কিশোরী মেয়ে শতদ্রু আর ভাই প্রীতম সিং। অন্যান্য বোর্ডাররা শীতের ভয়ে নীচে নামেনি। তাদের চা কাঞ্চা পৌঁছে দিয়ে এসেছে। ইন্দ্রজিৎ সিং স্বভাবতঃই মিতভাষী। বাংলা বিশেষ বলতে পারেন না। শতদ্রু ত্রিভাষিণী। বাংলা, ইংরাজী ও নেপালী। প্রীতম বাংলা বলে অপূর্ব। মিসেস ইন্দ্রজিৎ সিং এই আসরে নীরব শ্রোতা, কারণ তিনি নেপালী ছাড়া অন্য কোন ভাষাই জানেন না।

চায়ের টেবিলে মিসেস সিং চা তৈরী করেন। পরিবেশন করে প্রীতম। প্রীতমের মুখ চলছে সর্বদা। কখনও মুখ ভর্তি

খাবার, কখনও গাল ভর্তি কথা। সেদিন দার্জিলিং-এর বাতাসে কনকনে ভাবটা ছিল বড় বেশি আর বাইরে তুষার ঝরছিল ক্রমাগত।

সকলকে চা পরিবেশন করে প্রীতম নিজের জায়গায় বসে বলল, মিস্ মিত্র, দার্জিলিং-এ কোথায় কোথায় ঘুরলেন?

ঘুরলাম আর কই, শ্রীলা বলল, মাউণ্টেনিয়ারীং ইনষ্টিটিউট যেতেই তো হাঁটু ব্যথা হয়ে গেল।

হাউ ফানি! হাত তালি দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল শতদ্রু, এইটুকু পথ হাঁটতেই হাঁটু ব্যথা হয়ে গেল। কাঞ্ছিদের দেখেছেন, কত বড় বড় ঝুড়ি মাথায় নিয়ে পাহাড়ে ওঠে।

না, কাঞ্ছি দেখিনি, ললিতা বলল, তবে কঞ্ছি দেখেছি।

মানে? শতদ্রু ভ্রু তুলে জিগ্যেস করে।

কঞ্ছি মানে তুমি, সকৌতুকে ললিতা বলল।

শ্রীলা জোরে হেসে ওঠে। শতদ্রুও হাসে, না বুঝে।

ভিক্টোরিয়া ফলস্ দেখেছো? শতদ্রু আবার শুধোয়।

হ্যাঁ, ফলস্ই বটে। ললিতা বলে, একদম ফলস্। আগাগোড়া যেন ফুটো কলসি দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

তা অবশ্য মিথ্যে নয়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে প্রীতম বলল, তবে কোন অবজেক্টের সৌন্দর্য অধিকাংশ সময়েই তার অবস্থিতির জন্য। একরত্তি দার্জিলিং শহরের মধ্যে যদি নায়গ্রা ফলস থাকত, তাহলে দার্জিলিং থাকত না। লেবং রেস কোর্স দেখে যদি গড়ের মাঠের সঙ্গে তার তুলনা করবার ইচ্ছে হয়, তাহলে দার্জিলিং-এর প্রতি অবিচার করা হবে। কাঞ্ছিদের ঝুড়ি ওদের পিঠেই মানায়। নিদেন পক্ষে শতদ্রুর ঘাড়েও সেটা মানালে মানাতে পারে, কিন্তু আপনার বা মিস মিত্রের পিঠে নিতান্তই বেমানান।

ললিতা প্রীতমের কথা শুনে শুধু মৃদু হাসল। মুগ্ধ হল শ্রীলা।

টাইগার হিলে সানরাইজ দেখেছো? আবার শতদ্রুর-প্রশ্ন।

শতদ্রুর মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে প্রীতম বলল, টাইগার হিলের সূর্যোদয় অপূর্ব। পৃথিবীতে যে কত রং আছে টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের বর্ণালী না দেখলে কল্পনা করা যায় না। উপরি পাওনা হিসাবে পথের আনন্দ, ঘুম মনাষ্ট্রি, সিঞ্চল লেক আর কাভেণ্ডিস ডেয়ারী ফার্ম।

দু একদিনের মধ্যেই যাবো। শ্রীলা বলে, আপনি যাবেন নাকি ?

প্রীতম আফশোষ করে বলল, আপনাদের এমন সুন্দর কম্পানী মিস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে মিস মিত্র। কিন্তু আমার বোধহয় যাওয়া হয়ে উঠবে না। তবে আপনি যদি সময় করে আমার ষ্টুডিওতে আসেন, আপনাকে সানরাইজের ছবি দেখাবো।

বেশ তো, যাবো। শ্রীলা বলে, তুই যাবি নাকি ললিতা ?

ললিতা অভিমানের সঙ্গে বলে, ও তো আমায় বলেনি।

প্রীতম ললিতার দিকে তাকাল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, আমি ভেবেছিলাম আপনি বলার অপেক্ষা রাখবেন না।

ললিতার মুখের মাঝে ঈষৎ লজ্জার আভা খেলা করে যায় অকস্মাৎ।

বাঃ ব্লাশ করলে তো আপনাকে বেশ সুন্দর দেখায়।

ললিতা লজ্জিত হল আবার। ওর মুখে যেন আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ।

শ্রীলা বলল, ইচ্ছে করলে ছবিগুলো এখানে এনেও দেখাতে পারতেন।

অবশ্যই, প্রীতম বলে। কিন্তু ষ্টুডিওতে ছবিগুলো দেখলে আপনি শিল্প ও শিল্পী দুজনকেই বুঝতে পারবেন। এখানে হয়ত আপনি শিল্পের মাঝে বিলীন হয়ে যাবেন। শিল্পীকে মনেও থাকবে না, এবং আমার বিশ্বাস, সৃষ্টিকে বোঝার জন্য স্রষ্টাকেও বোঝা প্রয়োজন। তার আনন্দ, দুঃখ, যন্ত্রণা সবকিছু। সব।

কাকার ছবিগুলো দেখে কিছুই বুঝবে না। শতদ্রু পশমের কাঁটায় একটা ফাঁস দিয়ে সাজিয়ে রাখে। কালো ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের মাঝে একটা গোল মত কি যেন। কাকা বলে এইটাই টাইগার হিলের সূর্য।

হ্যাঁ তোর মত। প্রীতম বলে সোয়েটার বুনতে দিলে কার্ডিগান তৈরী হয়। কার্ডিগান বুনতে দিলে পুলওভার। আবার পুলওভার বুনতে দিলে—

প্রীতমের মুখে হাত দিয়ে থামিয়ে দেয় শতদ্রু। বোল না বোল না কাকা। শতদ্রুর চোখ ছল ছল করে।

প্রীতম কোটটা কাঁধের উপর ঝুলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে এসে বলে, তাহলে কখন আসবেন?

কখন আপনার সুবিধে?

রাত্রিতে আসুন।

রাত্রিতে কেন? ললিতা শুধোয়।

নিওন আলোতে ফোটোর সৌন্দর্য বেড়ে যায়।

তাহলে ফটোগুলোর ওপর আপনার আস্থা নেই বলুন: দিনের আলোয় ফাঁকি ধরা পড়ে যেতে পারে।

ঠিক সে কথা নয়। অতি সুন্দরী মেয়েকেও লোকে পাত্রপক্ষের কাছে বিনা প্রসাধনে বার করে না। ওটা সুন্দরকে অনিন্দ্য সুন্দর করবার প্রয়াস। তাছাড়া ফটোতে টেকনিক্যাল খুঁত ছাড়া ফটোগ্রাফারের অন্য কোন দায়িত্ব নেই। ফটোর মধ্যে কোন জিজ্ঞাসা নেই। ওটা আগাগোড়া সত্যি। ছবির মধ্যে খুঁত ধরতে পারেন, কারণ ওটা কল্পনা।

যা সত্যি, তার মধ্যে কি কোন ফাঁকি নেই?

প্রীতম হাসল। 'সত্য রয়েছে জীবনের গভীরে। ডুবুরীরা সাগর ছেঁচে মুক্তো তোলে ওটা সত্যি। কিন্তু বেলাভূমিতে পড়ে থাকে যে রঙ্গীন ঝিনুক ওটা ফাঁকি। কিন্তু আর না। আমার মনে

হচ্ছে আমি বোধহয় খুব বড় বড় কথা বলে ফেলছি। এবার চলি।'

ললিতা আর শ্রীলাও ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। 'চলুন একসঙ্গেই বেরোন যাক। আমাদেরও কয়েকটা শপিং বাকী আছে।'

এতক্ষণ যে দুজন নীরব শ্রোতার ভূমিকা নিয়ে বসেছিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ সিং ও মিসেস সিং, এবার ওঁরা মৃদুস্বরে আলাপ সুরু করেন।

ললিতা, শ্রীলা আর প্রীতম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। আনমনে সোয়েটার বুনতে লাগল শতদ্রু।

দীর্ঘক্ষণ পরে রোদ ওঠে। উজ্জ্বল আকাশ। দার্জিলিং চঞ্চল হয়ে ওঠে। নানা রঙের সমাবেশের মধ্যে হারিয়ে যায় তিনটে পথ চলতি মানুষ।

সন্ধ্যে বেলায় প্রীতমের ষ্টুডিও থেকে একাই ফিরছিল শ্রীলা। ললিতা যায়নি। প্রীতম ভারী আশা করেছিল ললিতাকে। বেচারী প্রীতম। প্রীতম জানে না গভীর অপ্রত্যয়ের সমুদ্রে ভাসছে ললিতা। উত্তাল সমুদ্রের বুকে ডিঙ্গি নৌকার মত।

প্রীতম আগ্রহের সঙ্গে ছবি দেখায় শ্রীলাকে। রঙ্গীন ছবিতে সূর্যোদয়ের বর্ণালী। আকাশে সাত রঙের খেলা। কুয়াশায় ঘোমটা দিয়ে আকাশের বুকে ডানা মেলা সোনালী সকাল। পৃথিবীতে অনেক রঙ্গ। কিন্তু সূর্যের সাতটি রঙ্গের মাঝেই তার ঠিকানা। প্রীতম আগ্রহের সঙ্গে শ্রীলাকে ছবিগুলোর ইতিহাস শোনায়। ছবিগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কোন মনোরম কাহিনী।

এই সন্ধ্যেটা প্রীতমের ষ্টুডিও উষ্ণ আবেশে হয়ত আরও নিবিড় হয়ে উঠত যদি ললিতা থাকত, শ্রীলা ভাবল এবং শ্রীলা বলল ; ললিতা এলে বেশ হত, কি বলেন ?

প্রীতম ছবিগুলো আনমনে গোছাতে গোছাতে বলল, মানুষের মন সমুদ্রের চেয়েও গভীর, সাধ্য কি তার তল খুঁজে পাই।

একটি হাসি হাসি মুখ পাহাড়ী মেয়ের পোট্রেট দেখতে দেখতে শ্রীলা বলল, আপনি রাগ করছেন।

প্রীতম হেসে ফেলল না-না, রাগ আমি করছি না। তাছাড়া রাগ করার অধিকারও আমার নেই। আপনারা সমতলের মানুষ। তুদিনের জন্য এই পাহাড়ী জায়গায় এসেছেন বেড়াতে, আবার চলে যাবেন। এক তুদিনের অন্তরঙ্গতার কিই বা দাম। আপনারা এই অন্তরঙ্গতার কথা মনে রাখেন না। ভুলে যান সব কথা, আর কথা দেওয়া, কিন্তু আমরা ভুলি না। ভুলতে পারি না। সমুদ্রের আকাশে পাখী যে হারিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখে, সে কথা সাগর কি মনে রাখে ?

হঠাৎ পোয়েটিক হয়ে উঠলেন ?

আমি ছেলেবেলা থেকেই পোয়েটিক মিস মিত্র। দার্জিলিংয়ের রাস্তায় হঠাৎ এ্যাকসিডেন্টের মধ্য দিয়ে কোন এক লাবণ্যের সঙ্গে পরিচিত হবার স্বপ্ন আমি দেখি না। কিন্তু আপনিই বলুন তো, কোন হঠাৎ পরিচিত মানুষের কথা ভেবে আপনার কি মনে হয় না, এর সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘ দিনের, বহু যুগের, যুগান্তের।

সহসা কোন কথা বলতে পারে না শ্রীলা। প্রীতম আবার বলে, আপনি আমাকে পেয়োটিক বলছিলেন কথাটা মিথ্যে নয়। দার্জিলিং এর রোদ আর কুয়াশার মিতালী আমাকে পাগল করে দেয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে শীর্ষে আলো ছায়ার লুকোচুরি, পপলারের শাখায় শাখায় কাঁপন, আর পাইনের দীর্ঘশ্বাস শুনে মনে হয় আমি যেন আমার মধ্যে নেই। আমি যেন হারিয়ে গেছি প্রীতমের চোখে সুদূরের স্বপ্ন।

দেওয়ালে ফোটো ষ্ট্যাণ্ডে আর র‍্যাকে দার্জিলিং-এর অসংখ্য

মুহূর্তকে বন্দী করে রেখেছে প্রীতম। চারিদিকে শুধু ছবি। পোর্ট্রেট আর ল্যাণ্ডস্কেপ। আঁকা ছবি আর তোলা ছবি।

প্রীতম সেদিন ঠিকই বলেছিল ষ্টুডিওতে না গেলে শিল্পীকে বোঝা যায় না।

আমি তাহলে আজ উঠি, শ্রীলা বলল।

প্রীতম চমকিত হল। না, না, সেকি! আপনি আজ প্রথম এসেছেন আমার ষ্টুডিওতে. এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াটা শুধু অশোভন নয়, অসামাজিকও বটে। কি খাবেন বলুন? চা—কফি?

শ্রীলা খিলখিল করে হেসে উঠল। আপনি আমার সঙ্গে কুটুম্বিতে করছেন।

তা বলতে পারেন। প্রীতম বলল, সাত পা একসঙ্গে হাঁটলেই যদি বন্ধুত্ব হয় তাহলে একই বাড়ীতে সাতদিন একসঙ্গে থাকলে সেটা নিশ্চয়ই বন্ধুত্বের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর কিছু হয়।

আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি মিঃ সিং।

কেন? প্রীতম অবাক হল শ্রীলার অবাক হওয়ায়।

ভাবছি আর অবাক হচ্ছি। চমৎকার বাংলা অনেক অবাঙ্গালীই বলতে পারেন, কিন্তু চমৎকার কথা অনেকেই বলতে পারেন না।

প্রীতম সবিনয়ে বলল, আপনার অনুগ্রহ। আমি কিন্তু দার্জিলিং-এ বসে বাংলা শিখিনি। বাংলা শিখেছি আপনাদেরই বিশ্বতীর্থ শান্তিনিকেতনে, এবং আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না, একদা আমি বাংলায় কবিতা লিখতাম।

কবিতা?

আশ্চর্য হচ্ছেন? কিন্তু বিশ্বাস করুন সত্যিই লিখতাম। কিন্তু এখন আর লিখি না।

কেন?

লিখি না। কোন কারণ নেই।

প্রীতম আর ললিতার মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম মিল খুঁজে পেল শ্রীলা।

একটা বাচ্চা নেপালী ছেলে কফি নিয়ে এল। কাপে কফি ঢালতে ঢালতে প্রীতম বলল, আপনার পদার্পণে আমার ষ্টুডিও ধন্য হল।

কফিতে চুমুক দিয়ে শ্রীলা বলল, যদি ললিতাও আসত ?

তাহলে শুধু ধন্যই নয়, পুণ্যও হত। তারপর ওরা একসঙ্গে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে প্রীতম বলল, বাইরে কুয়াশা জমেছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার কুয়াশা বড় খেয়ালী।

প্রীতমের কাছে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বার হল শ্রীলা। প্রীতম ঠিকই বলেছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার কুয়াশা কখনও উজ্জ্বল, কখনও অস্পষ্ট কখনও মধুর, কখনও বিধুর।

আলোকোজ্জ্বল দার্জিলিং শহর। পার্বতী পসারিণী ম্যাল মোহিনী বেশ ধারণ করে হাতছানি দেয় পথচারীদের। সমতলের মানুষ অসমতলে এসে দিশা খুঁজে পায় না।

এভারেষ্ট কিউরিওর সামনে হাজার জনের জনতার মাঝে উঁকি মারল, আবার সেই সাদার কারুকাজ করা লাল রং-এর টাই। অনেক রূপ আর রঙের মাঝেও একটি সেই নীল স্যুট স্পষ্ট হয়ে উঠল। হ্যাঁ, সে-ই নিখিলেশ। আপন মনে সিগারেট টানছিল নিখিলেশ।

শ্রীলা এগিয়ে গেল, এবং আবার দেখা হল।

নিখিলেশ হাসল। দার্জিলিং শহরের আয়তন অত্যন্ত কম। তাছাড়া আমি আশা করেছিলাম আজ আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

সত্যি ? শ্রীলা বলল, আমি ভেবেছিলাম দার্জিলিং শহরে আমরা যে যার ঠিকানায় হারিয়ে গেছি। দেখা হবে না আর।

দেখা যদি নাই হত ?

বারে—আপনার ঠিকানা আমার কাছে নোট করা আছে।

ঠিকানা ' নিখিলেশ চমকাল তারপর বলল, ও, হ্যাঁ সার্কিট হাউস। কিন্তু সেখানে অজস্র মানুষের ভীড়ে আমায় হয়ত খুঁজে পেতেন না।'

চলুন, ম্যালের বেঞ্চে বসা যাক।

নিখিলেশ আর শ্রীলা বেঞ্চে বসল। এখন বেঞ্চগুলো অধিকাংশই ফাঁকা। দার্জ্জিলিং এর সৌন্দর্য্য পিপাসুরা ঘরে ফিরে গেছে অনেকক্ষণ। অবজীরভেটরীর রোড লাইটগুলো উৎরাইএর আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে।

বুদ্ধমন্দির থেকে মাসে মাসে একটা বিলম্বিত ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। শ্রীলা উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

কি শুনছেন?

ঘণ্টার শব্দ।

এই ঘণ্টাধ্বনির একটা ইঙ্গিত আছে। দীর্ঘ যাত্রা পথে একটা বিরতির সঙ্কেত। অর্থাৎ থামো। তোমার পথ চলার অবসান হয়েছে। এবার ফিরে এসো।

কিন্তু এই শব্দ কি সবাইকে ডাকে?

ও তো ডাক নয়। বিরাট জনতার মাঝে একটা অনির্দিষ্ট হাতছানি। সবাই ভাবে, হয়ত আমাকেই ডাকছে। কিন্তু সবাই যায় না। যায় শুধু তারাই যারা জানে এই ডাক তাদেরই উদ্দেশে।

এই ঘণ্টার শব্দ শুনলে মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

কিন্তু এখনই ও ডাকে কান দেবেন না। ও ডাক আপনার জন্য নয়। নিখিলেশ বলল।

মাটির পৃথিবী থেকে অনেক উর্দ্ধের এক পৃথিবীতে সমতলের একটি মেয়ে অকস্মাৎ যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলল। ম্যালের এই ছমছমে স্তব্ধতা, দূরাগত সঙ্গীতের মত এই ঘণ্টাধ্বনি আর জলা পাহাড় থেকে ভেসে আসা হিমেল বাতাসে পাহাড়িয়া ফুলের

সুগন্ধ……শ্রীলার মনে হল ও যেন হারিয়ে গেছে। শ্রীলার মনে হল গম্ভীর এই বজ্রনির্ঘোষ যেন প্রিয়জনের ডাকে সাড়া দেবার সঙ্কেত। শ্রীলার আরও মনে হল, একটা আশ্চর্য্য যন্ত্রণা যেন এতদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ওকে, কোন যাদুকরের স্পর্শে সেই যন্ত্রণাটা যেন নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেল। নিখিলেশের পাশে ঘন হয়ে বসল শ্রীলা। নিখিলেশের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আবেগের সঙ্গে শ্রীলা বলল, ঠিকই বলেছ, ও ডাক আমার জন্য নয়।

শৈল নগরীর স্নায়ু কেন্দ্রে অর্দ্ধচেতন আর অচেতনতার মাঝে আচ্ছন্নের মত নিখিলেশ বলল, সাড়া দেবার ডাক একদিন আসবে। নিখিলেশের হাতের মধ্যে শ্রীলার হাত নিশ্চিন্ত বিহঙ্গের মত ঝিমিয়ে রইল। নিখিলেশ আর একবার হার মানল তার নিজের কাছেই। এ যেন অন্য নিখিলেশ। অন্য কেউ। হয়ত সেই অন্ধ দেবতার অভিপ্রায় অন্য, নাহলে বার বার শ্রীলার সঙ্গেই দেখা হবে কেন?

কিউরিওর দোকানগুলো বন্ধ হচ্ছে। গ্রীনার্স হোটেলে নৃত্যরত নরনারীদের পা কাঁপছে এবার, চোখ গোলাপী। নিঝুম ম্যাল।

আবেশে নম্র চোখ দুটো তুলে শ্রীলা জিগোস করল, তুমি দিল্লী ফিরে যাবে কবে?

ঠিক বলতে পারছি না। নিখিলেশ বলল, আমাদের সব কিছু বাঁধা আছে মন্ত্রীদের মর্জ্জির কাছে। কিছুই বলা যায় না, হয়ত শুনব আগামী কালই ফিরে যেতে হবে, কিংবা হয়ত দেরী হবে আরও পনের দিন, তখন চল্‌ মুসাফির, বাঁধ্‌ গঁঠরিয়া।

এবার তাহলে—শ্রীলা বলল।

নিশ্চয়ই—নিখিলেশ।

পৌঁছে দেবে না?—শ্রীলা।

আজ তুমি একাই যাও—নিখিলেশ।

তুমি—শ্রীলা।

আমিও একাই ফিরে যাব। যেতে যেতে ভাবব এবং তুমিও। তারপর আবার ভাবব এবং আবার। আমার চোখে তন্দ্রা নামবে স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

শ্রীলার মনে গুণগুণিয়ে উঠল একটি গানের সুর, 'ঘরেতে ভ্রমর এল'। বিদায় নেওয়ার আগে শ্রীলা বলল, কাল টাইগার হিলে যাচ্ছ তো?

নিশ্চয়ই।

তারপর বিদায়।

শ্রীলা নিখিলেশের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হোটেলের পথ ধরল।

হোটেলের ডাইনিং রুমে অপেক্ষা করছিল শতদ্রু। শালটা ঘোমটার মত মাথায় জড়িয়ে হোটেলে ঢুকল শ্রীলা।

শ্রীলাদি, এতো দেরী! ঠোঁট ফুলিয়ে শতদ্রু বলল।

সত্যি ভারী দেরী হয়ে গেছে অপরাধির মত বলল, রাগ কর না শতদ্রু লক্ষ্মীটি। পোষাক পাল্টে ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে আমি এক্ষুনি আসছি।

ললিতাদি তো কাকার ষ্টুডিওতে।

বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রীলা বলল, ষ্টুডিওতে গেছে?

ললিতাদি সন্ধ্যে পর্য্যন্ত শুয়েছিল তারপর হঠাৎ বেরিয়ে গেছে। এই মাত্র কাঞ্ছা খবর দিয়ে গেল।

শ্রীলা একটু আশ্চর্য্য হল।

আর একবার মনে পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘার কুয়াশা বড় খেয়ালী।

শ্রীলা ভেবেছিল টাইগার হিলে নিখিলেশের সঙ্গে দেখা হবে। ললিতা তখনও লেপের ভেতর। শেষ রাত্রের ঝিমধরা ঠাণ্ডায় উঠে ষ্টোভ ধরিয়ে চা করল শ্রীলা। ললিতাকে ঘুমের মাঝেই চা দিয়ে

পাউডারের ছোপ বুলিয়ে নিল মুখে, তারপর কার্ডিগানটা চড়িয়ে ললিতাকে আর একবার তাড়া দিয়ে শতদ্রুর দরজায় টোকা মারল শ্রীলা। শতদ্রু জেগেই ছিল। দরজা খুলে শ্রীলাকে দেখে শতদ্রু বলল, শ্রীলাদি তুমি একেবারে রেডী।

শ্রীলা হাসল। তোমার কাকা রেডী তো?

কিযে বলো শ্রীলাদি, শতদ্রু বলল, এই তো সবে আড়াইটে। জীপ আসবে সাড়ে তিনটের সময়।

তা হোক। আগের থেকে তৈরী থাকলে ক্ষতি কি।

ললিতা টুথব্রাস ঘষছিল। শ্রীলাকে দেখে বলল, শ্রীলা, আশ্চর্য্য সখ তোর। এই হাড় কাঁপানো শীতে টাইগার হিলে কি না গেলেই নয়? তুই পাগল হয়েছিস ললিতা! কলকাতা গিয়ে সে মুখ দেখাতে পারব না। ছোড়দার কাছে দাঁড়াব কি করে? সেবারে রাণীমাসীমা দিল্লী পর্যন্ত গিয়ে সময়ের অভাবে আগ্রা পর্যন্ত যেতে পারেননি শুনে ছোড়দার কি হাসি। সেই ভুল আমি আবার করি। নে, তৈরী হয়ে নে।

ঠিক সাড়ে তিনটের সময়ে জীপের হর্ণ শোনা গেল। আরোহী মাত্র চারজন। শ্রীলা, শতদ্রু, ললিতা আর প্রীতম।

প্রীতম আর শতদ্রু বহুবার গেছে টাইগার হিলে। তবু সূর্যোদয় দেখার সখ এখনও মেটেনি। সে সূর্যোদয় নাকি নিত্যই নতুন। তাছাড়া নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে পথযাত্রার আনন্দের আকর্ষণও কম নয়।

কপাল ভাল থাকলে তবেই টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখা যায়। শতদ্রু বলল।

কেন? শ্রীলা শুধোল সূর্য কি সবদিন ওঠে না?

ওঠে তবে অধিকাংশ দিনই কুয়াশায় ঘোমটা দিয়ে। প্রীতম বলল।

কি রকম? শ্রীলা শুধোল আবার।

সূর্য্য ওঠার আগে খানিকক্ষণ ভোরের কুয়াশার সঙ্গে লুকোচুরী

খেলে তারপর হয়ত মেজাজ ভাল থাকলে একের পর এক পৃথিবীর সব রঙের ওড়নাগুলো পরতে পরতে খুলে হঠাৎ হারিয়ে যায় কোন দূর পাহাড়ের কোলে, অথবা হয়ত দুষ্টু ছেলের মত হঠাৎ উঁকি মেরে আগন্তুকদের আকাঙ্ক্ষাকে বিদ্রুপ করে অদৃশ্য হয় কুয়াশার আড়ালে।

কতক্ষণ চলে এই রঙের খেলা?

অত্যন্ত সামান্যক্ষণ। তারপর কুয়াশার প্রাচীর ভেদ করে সূর্য যখন উদয় হয় পূর্ব আকাশে, তখন আর সূর্যের কোন চাপল্য নেই। রঙের জৌলুষ নেই, বর্ণের বাহার নেই। দামাল ছেলের দুষ্টুমি নেই। তাই বলছিলাম, টাইগার হিলের সূর্য খেয়ালী শিল্পীর মত।

জীপ বেগে ছুটে চলেছে। উইণ্ড স্ক্রীনগুলো বন্ধ। ড্রাইভারের সামনের কাঁচে কুয়াশা জমেছে। ওয়াইপারটা মুছে চলেছে সর্বদা। জীপের ভেতরটা বেশ উষ্ণ হয়ে উঠেছে।

কাল ললিতাকে কোন ছবিগুলো দেখালেন? আচমকা জিগ্যেস করল শ্রীলা। ললিতা এবং প্রীতম দুজনাই বিব্রত ও লজ্জিত বোধ করল।

প্রীতম খানিকটা অপরাধীর মত বলল, আমি কিন্তু সত্যিই জানতাম না যে উনি এসে পড়বেন।

ললিতা বলল, আমি প্রথমে ঠিক করেছিলাম যাব না। কিন্তু শুয়ে শুয়ে এমন বিরক্ত লাগল যে—।

ললিতা থামিয়ে দিল শ্রীলা, কৈফিয়তের প্রয়োজন কি। তাছাড়া এতে লজ্জিত হওয়ারই বা কি আছে?

সে কথা নয়, একা একা ভাল লাগছিল না। ললিতা আমতা আমতা করতে লাগল, ভেবেছিলাম তোকেও হয়ত ষ্টুডিওতেই পাব। ওখানে গিয়ে শুনলাম তুই বেরিয়ে গেছিস।

প্রীতম আপন মনে সিগারেট টানতে লাগল। খানিক আগের

লজ্জাকর অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রসঙ্গ পাল্টাল ললিতা। আজ সেই ভদ্রলোক আসবার কথা ছিল না?

কোন ভদ্রলোক? না বোঝার ভান করল শ্রীলা।

দার্জিলিং-এ তোর হঠাৎ পরিচিত সেই বন্ধু ভদ্রলোকটি যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করে দেওয়ার কথা।

ললিতা অত্যন্ত চতুর। ললিতা জানে শ্রীলাকে ঘায়েল করার এটাই একমাত্র অস্ত্র।

শ্রীলা অত্যন্ত অপ্রতিভ ভাবে জবাব দিল, আসতে পারে হয়ত।

আসতে পারে মানে? আসতে বলিসনি তুই।

হঠাৎ শ্রীলার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। গতকাল রাত্রেই বলেছি। এতো শিগগির ভুলে যাওয়ার তো কোন কারণ দেখছি না।

ললিতা মুখ টিপে হাসল। মাত্র গতকাল রাত্রে! অর্থাৎ গতকাল রাত্রে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

দেখা হয়েছিল মানে, ইয়ে—এবার শ্রীলার পালা।

ললিতার ঠোঁটে বাঁকা হাসি। প্রীতম সিগারেটের ধোঁয়ার রিং তৈরী করায় মগ্ন। শতদ্রু ঢুলছে।

ষ্টুডিও থেকে তাহলে তুই সোজা ওখানেই গিয়েছিলি?

বারে! আমি কি ঠিকানা জানি? রাস্তায় দেখা হয়ে গেল, তাই।

তাই খানিকক্ষণ গল্পসল্প করে—

না—মানে ইয়ে

ওটা গ্রহের ফের। না হলে তোর সঙ্গে ষ্টুডিওই বা যাব না কেন, তোকে একাই ষ্টুডিও থেকে ফিরতেই বা হবে কেন, আর পথের মাঝেই বা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হবে কেন।

মিস মিত্র, আমি কিন্তু নিমিত্তের হেতুমাত্র। আমাকে যেন অপরাধী ভাববেন না।

শ্রীলা লজ্জায় রক্তিম হল।

আপনার এই বন্ধুটি কি নবলব্ধ? প্রীতম শুধোল আবার।

নবলব্ধ বৈকি শ্রীলার হয়ে ললিতাই জবাব দিল এবং দার্জিলিং-লব্ধও বটে। সদালপী, নিরহংকার, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

টীকা নিস্প্রয়োজন। শ্রীলা ওকে থামিয়ে নিল। এদের খুনসুটি উপভোগ করছিল প্রীতম। প্রীতম বলল, দার্জিলিং-এর পরিচয় সর্বদাই আকস্মিক। বদ্রাওনের নবাবনন্দিনী বা লাবণ্যর সঙ্গে পরিচয়ের মত।

জীপ ঘুমের বাঁকে ঘুরছে। টাইগার হিল আর মাত্র কয়েক মাইল। গাড়ী এবার চড়াই উঠবে।

জীপের দোলানীতে ঘুমিয়ে পড়েছিল শতদ্রু।

রাস্তার দুপাশের বন জঙ্গল কুয়াশায় আবৃত। বিসর্পিল চড়াই উৎরাই-এর পথ বেয়ে গাড়ী উঠছে নামছে। কুশলী ড্রাইভার ক্ষিপ্র-গতিতে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। বিন্দু বিন্দু কুয়াশা জমেছে উইণ্ড স্ক্রীনে। জীপের হুডের একটা অদৃশ্যপ্রায় ছিদ্র দিয়ে বাতাস ঢুকছে। ভেতরের উষ্ণতার আমেজ কেটে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। শতদ্রুর গায়ে আলোয়ানটা ভাল করে জড়িয়ে দিল ললিতা। তারপর কান পর্যন্ত শাল মুড়ি দিয়ে বসল। প্রীতম অন্যমনস্ক। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে শ্রীলা। জীপের মধ্যে মৃদু আলাপ। শ্রীলা এবং ললিতার।

ললিতা। কি ভাবছিস?

শ্রীলা। কিছু না তো!

ললিতা। তুই কি ভাবছিস আমি জানি।

শ্রীলা। কি বল তো?

ললিতা। তুই ভাবছিস ভদ্রলোক যদি না আসেন। যদি কথা ওখানে দেখা না রাখেন?

প্রীতম। বাজে কথা। আমি ওকথা ভাবিনি মোটেই।

ললিতা। তোর চোখ তুই নিজে দেখতে পাচ্ছিস না শ্রীলা। তোর চোখে একটি প্রতীক্ষার স্বপ্ন টলমল করছে।

শ্রীলা জবাব দিল না। জীপের আওয়াজ ও তার সঙ্গে শ্রীলা ও ললিতার মৃদুস্বরে আলাপ পাখীর গুঞ্জনের মত শোনাচ্ছিল। জীপটা থামতেই ওরা দেখল, টাইগার হিলের অবজার্ভেটরীর নীচে এসে দাঁড়িয়েছে।

চারপাশে অসংখ্য গাড়ীর মিছিল। এখানে হাল মডেলের সুদৃশ্য গাড়ীর সংখ্যা বড় বেশী নেই। জীপ আর ল্যাণ্ড রোভার।

কাফেটোরিয়াতে অসংখ্য মানুষের ভীড়। একটা টেবিলে ঘিরে বসল ওরা চারজন। অনেক মানুষের ভীড়ে শ্রীলার দৃষ্টি একটি মানুষকে খুঁজে ফিরতে লাগল।

ললিতা হাসল শুধু।

কুয়াশা কেটে গেছে। এবার সূর্য উঠবে দূর পাহাড়ের কোলে। ওরা উপরে উঠল। একপাশে রেলিং ধরে দূরের পানে তাকিয়ে রইল। প্রীতম ক্যামেরাটা ঠিক করতে লাগল। শ্রীলার দৃষ্টি তখনও খুঁজে ফিরছে একটি পরিচিত মুখ। অসংখ্য লোক। নানা সাজ, নানা সজ্জা। যেন একটি আন্তর্প্রাদেশিক সম্মেলন। তার মাঝে সেই সমুদ্র নীল পোষাককে খুঁজতে লাগল শ্রীলা। সাদার কারুকাজ করা এক জোড়া শ্বেত কপোত।

পিছনে পড়ে রইলো সূর্যোদয়ের বর্ণালী। মনের পটে রঙের যে ছোঁয়া লেগেছে তারই মায়ায় বিভোর শ্রীলা। প্রিয়জনের আসঙ্গ কামনায় বিধুর মন অন্য কোন সুন্দরের ডাকে সাড়া দিতে চায় না। টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের বর্ণালী খেলা করুক হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, ছড়িয়ে পড়ুক পাইন আর পপলারের শাখায় শাখায়। শ্রীলার মন অতনুর স্পর্শে রঙীন হ'য়ে উঠেছে। সেই রঙএ রঙ মেশাতে শ্রীলার মন প্রাণ শুধু নিখিলেশকেই চায়।

কিন্তু না। শ্রীলার আকুল দৃষ্টি হতাশ হয়ে ফিরে এল। সে আসেনি।

প্রীতম ক্যামেরা রেডি করে ভিউ ফাইণ্ডারএ চোখ রেখে সূর্য উদয়ের সুন্দরতম মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষা করছিল। পূব আকাশে রঙের হোলী খেলা সুরু হয়েছে। কোন নিপুন কারিগর যেন সাতটা রঙ দিয়ে আকাশের বুকে হাজার রঙের বিন্যাস সৃষ্টি করে চলেছে। এত রঙ আছে পৃথিবীতে!

প্রীতম সাটারে হাত দিয়ে ছিল। আকাশ ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে। কখনও লাল, কখন নীল, কখনও বেগুনী, রামধনুর সাতটা রঙ যেন ঝরে ঝরে পড়ছে।

আর একটু। সব রঙ গুলো খেলা করুক আকাশের গায়ে। দ্যুতিময় হয়ে উঠুক পূবাকাশ। সাটারএ আলতো হাত দিয়ে রইল প্রীতম, কিন্তু প্রীতমের সব প্রতীক্ষাকে ব্যার্থ করে দিয়ে টাইগার হিলের ছলনাময়ী আকাশ এক মুঠো কুয়াশা ছুঁড়ে দিল সূর্য্যের গায়ে। তারপর আরএক মুঠো। তারপর আবার। পূব আকাশটা অভিমানী মেয়ের মত থমথমে হয়ে উঠল।

সাটার থেকে হাত নামাল প্রীতম। একজন নীলাক্ষি বিদেশিনীও ক্যামেরায় চোখ দিয়ে একটি অনন্ত মুহুর্ত ধ'রে রাখবার জন্য সাটারে হাত দিয়েছিলেন। হতাশ হয়ে তিনিও হাত নামিয়ে নিলেন।

প্রীতম ললিতা আর শ্রীলার দিকে তাকিয়ে বলল চলুন। সূর্য্যোদয়ের খেলা শেষ।

শ্রীলা কাঁদো কাঁদো সুরে বলল ও মা, আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

প্রীতম হাসল। চলুন, ক্যাভেণ্ডিস ডেয়ারী ফার্ম, সিঞ্চল লেক আর ঘুম মনাষ্ট্রি দেখবেন। ওগুলো টাইগার হিলের ফাউ। মূলের ওপর উপরি।

আমার ভাল লাগছে না ললিতা। চল ফিরেই যাই। শ্রীলা বলল।

ললিতার চোখ দুটোও সহসা ছলছলিয়ে উঠল। প্রিয়জন কথা দিয়ে কথা না রাখলে তার ব্যথা দুঃসহ।

সে কথা ললিতাও বোঝে। ওরা চারজন জীপে গিয়ে বসল।

নিখিলেশের ব্যবহারে শ্রীলা বিস্মিত হল। শ্রীলার সকালটাকে নষ্ট করে দিয়েছে নিখিলেশ। একটা মনোরম স্বপ্নকে চৌচির করে দিয়েছে। ধীরধাম মন্দিরের চত্বরে বসে একটা নেপালী ছেলে একটা আকিডের পাপড়ীগুলো ছিঁড়ছিল। কয়েকটা পায়রা ঘাসের বীজ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। শ্রীলার কান্না পাচ্ছিল। রাগ হচ্ছিল গোটা পুরুষ জাতটার ওপর। নিখিলেশের এই ব্যবহারের কোন যুক্তি খুঁজে পায় না শ্রীলা। এখন বিকেল, ললিতা হোটেলে নেই। কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। প্রীতম আর শতদ্রু গেছে লেবং রেস কোর্সে ঘোড়দৌড় দেখতে। শ্রীলার হাতে অফুরন্ত অবসর। শ্রীলা অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করে। বাড়ীর কথা, কলকাতার কথা, কিন্তু না। থেকে থেকে নিখিলেশের কথাই মনে পড়ছে শ্রীলার। নিখিলেশ হয়ত বলবে কাজ ছিল। কিন্তু কি এমন ক্ষতি হত একদিনের জন্য কাজে অবহেলা করলে? অন্তত শ্রীলার জন্য? নিখিলেশ কি সে কথা বোঝে না?

কে যেন দরজায় টোকা মারল। উৎকর্ণ হয়ে শুনবার চেষ্টা করল শ্রীলা। তাহলে কি ললিতা ফিরে এল? অথবা প্রীতম কিংবা—একটা সম্ভাবনার আশা ঝিলিক হেনে গেল। মনের মাঝে একটা খুশিয়ালীর ঝড় যেন নিমেষে নিখিলেশের উপরে জমে ওঠা সব উত্তাপ, সব অভিমানকে উড়িয়ে দিয়ে গেল। নিশ্চয়ই নিখিলেশ। দরজা খুলল শ্রীলা। অনেক আশা শ্রীলার মনের মধ্যে।

কিন্তু না। নিখিলেশ নয়, ডাক পিওন।

চিঠি আছে।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল শ্রীলা। ব্রজবিলাস লিখেছেন। অনেক দিন তো হয়ে গেল দার্জিলিং-এ। এবার ফিরে যাওয়া দরকার। শ্রীলা ভাবল আজই ও কলকাতা ফিরে যাবে। সহসা আবার দরজায় টোকা মারার শব্দ শোনা গেল। শ্রীলা নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল ভেতরে আসুন।

শার্শিতে একটা দীর্ঘ ছায়া দেখে চোখ তুলে তাকাল শ্রীলা।

খুব চটে গেছ?

চটার কি আছে, শ্রীলার কণ্ঠ তেমনি নিরুত্তাপ। আমার সঙ্গ যদি আপনার ভাল না লাগে, অনুরোধ যদি মনে হয় জুলুম তাহলে নিশ্চয়ই না আসার অধিকার আপনার আছে।

নিখিলেশ হাসল। সম্বোধনটা হঠাৎ পাল্টে ফেললে। অন্তরঙ্গতার যে সীমাটুকু তুমি পার হয়ে এসেছিলে জানি না সেখান থেকে পিছিয়ে গেলে কেন।

আমি পিছিয়ে যাইনি, তুমি সরিয়ে দিয়েছ।

বিশ্বাস কর শ্রীলা—

নিখিলেশকে থামিয়ে দিয়ে শ্রীলা বলল, হঠাৎ একটা জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলে এই তো? মন্ত্রীদের সঙ্গে কোন উৎসব উদ্বোধন করতে গিয়েছিলে এই তো?

না, না, সে কথা নয়, তুমি অহেতুক রাগ করছ শ্রীলা। নিখিলেশ বিব্রত বোধ করল।

হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল শ্রীলা, আচ্ছা তুমি কি বলো তো? আমার জন্য কাজের একটু ক্ষতি না হয় হলই, না হয় মন্ত্রীদের কাছে একটু সময় ভিক্ষে করেই নিতে। ক্ষতি কি ছিল তাতে?

একটু সময় নয় শ্রীলা, জীবনের সব সময়টুকুই তুলে রেখে দিতে পারি তোমার জন্য। কিন্তু টাইগার হিলে যেতে না পারার কারণ অন্য। নিখিলেশ বলল।

শ্রীলা বলল, টাইগার হিলের সূর্য আমার জন্য অপেক্ষা করে

থাকেনি। কিন্তু তোমার পথ চেয়ে আমি সারাক্ষণই অপেক্ষা করেছিলাম, ভেবেছিলাম তুমি আসবে। কিন্তু তুমি আসোনি।

শ্রীলা, নিখিলেশ বলল, তোমার কাছে সব কিছু খুলে বলা দরকার। কারণ একটা অপরাধ বোধ আমাকে সর্বদা পীড়িত করছে। প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করছি। যাকে ভালবাসা যায় তাকে ঠকানো যায় না শ্রীলা, তাই আমার সব কিছু জেনেও—

বাধা দিয়ে শ্রীলা বলল, সব কথা নাই বা বললে। কিছু কথা থাক নাবলা।

কিন্তু শ্রীলা, আমি—

তুমি মানুষ নও! তুমি পাথর, তোমার হৃদয় বলে কিছু নেই। আজ সারা সকাল তুমি আমার সকল প্রতীক্ষাকে ব্যর্থ করে দিয়েছ। এই মনোরম সন্ধ্যায় মনে করো তুমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই। যত কিছু ভুল-ভ্রান্তি, দোষ গুণের কথা আজ নাহয় থাক। দোহাই তোমার—

কিন্তু একথা তোমাকে আমার বলা যে একান্ত প্রয়োজন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার পাল্লাটা দুহাতে ধরে ললিতা বলল, মাফ করবেন। ডিসটার্ব করলাম। উভয়েই কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত এবং বিব্রত।

নিখিলেশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল। শ্রীলা তার আগেই বলল, ললিতা, এঁর কথাই তোকে বলেছিলাম। ইনিই নিখিলেশ গুপ্ত। আমার অন্তরঙ্গ বান্ধবী ললিতা।

নমস্কার করে ললিতা বলল, আপনার কথা শ্রীলার কাছে অনেক শুনেছি।

নিখিলেশ হাসল।

সেদিন টাইগার হিলে আপনি না আসার জন্য শ্রীলা অভিমানে সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

ললিতা কি হচ্ছে, ভ্রুকুটি করল শ্রীলা।

ললিতা দুর্বার। এ কিন্তু নিখিলেশবাবু ভারী অন্যায় আপনার। আমি সে কথা স্বীকার করছি। নিখিলেশ বলল সব অন্যায়ের জন্য মার্জনা হয়ত চাওয়া যায় না। কিন্তু এই অপরাধ নিতান্ত অমার্জনীয় না হলে, আমি আপনাদের দুজনার কাছেই ক্ষমার্থী।

আপনি চতুর। ললিতা বলল, শুধু শ্রীলা নয়, এর মধ্যে আমাকেও জড়িয়ে ফেললেন। যাই হোক ভবিষ্যতে এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি হবে না এই আশ্বাসে আপনাকে ক্ষমা করা হল।

নিখিলেশ আশ্বস্ত হওয়ার ভাণ করল।

হাসল ওরা তিনজনেই। চায়ের টেবিলকে ঘিরে মুখরিত হল একটি সুন্দর সন্ধ্যা। সূর্যাস্তের রঙ্গ শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘাই নয় আরও তিনটি মানুষের মন সমান ভাবে রাঙ্গিয়ে দিল আজ সন্ধ্যায়।

তিনটি হৃদয়, তিনটি উন্মুখ তৃষ্ণা।

আপনার সঙ্গে পরিচয় হলে প্রীতম ভারী খুশি হত।

প্রীতম কে?

প্রীতম একটি প্রতিভা শ্রীলা বলল, অসমতলের মানুষের বুকে একটি সমতলের হৃদয়। প্রীতম আশ্চর্য বাংলা বলে, অপূর্ব ছবি আঁকে আর অদ্ভুত ফটো তোলে। এই হোটেলের মালিক আর আমাদের সকলের বন্ধু। বিশেষ করে—একটু হেসে ললিতার দিকে একবার তাকিয়ে কথাটা শেষ করল শ্রীলা—বিশেষ করে ললিতার।

ললিতার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হল।

আর কদিন রয়েছেন এখানে? প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য, স্বভাবতই, ললিতা শুধোল।

ঠিক বলতে পারছিনা, নিখিলেশ বলল, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। মন্ত্রীদের মন্ত্রণার উপর নির্ভর করছে আমাদের যাত্রাসূচী।

আপনারা কদিন?

শ্রীলা কালই কলকাতা ফিরে যাবে। ললিতা বলল।

বিস্মিত শ্রীলা শুধোল 'আর তুই?

আমি কাল ভোরে কালিম্পং যাচ্ছি।

হঠাৎ?

ঈষৎ লজ্জার সঙ্গে ললিতা বলল, প্রীতম বলছিল কালিম্পংএর প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি অপূর্ব। দার্জিলিং এসে কালিম্পং না গেলে দার্জিলিং আসাটা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

সঙ্গে তাহ'লে—

ললিতা হেসে বলল অবশ্যই প্রীতম।

এবার কিন্তু আমায় উঠতে হবে। সশঙ্কোচে নিখিলেশ বলল। এক্ষুনি? ললিতা শুধোল।

শ্রীলার ছলছল চোখ দুটোর দিকে একবার তাকিয়ে ললিতা বলল, কাজ থাকলে অবশ্য আপনাকে আটকাব না। চলুন আপনাকে নীচে রেখে আসি।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। শ্রীলা বিদায় সম্ভাষণ জানাল নিখিলেশকে। ললিতা বলল চলুন আপনাকে ম্যাল পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি, আমি একটু প্রীতমের স্টুডিওতে যাব।

সবে সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। দার্জিলিং-এর হিমেল বাতাস এখনও বইতে সুরু করেনি। সন্ধ্যার উতলা হাওয়ায় শুধু মাত্র তার ইশারা।

আবার কবে দেখা হবে? ললিতা শুধোল।

পৃথিবী অনেক বড়, আমাদের জীবনের বৃত্তও সীমিত নয়, কবে এবং কখন দেখা হবে তা কি বলা যায়?

যায় বৈকি যদি এই পরিচিতি, এই অন্তরঙ্গতা মনে রাখেন।

এর জবাব দিতে গেলে খানিকটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে যায়। কিন্তু সে কথা নাই বা শুনলেন।

আপনার আপত্তি থাকলে—

না, আপত্তি নয়। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে অনেক সময়ে আলাপকে বিরক্তিকর করে তোলে, তাই। আমি আজন্ম বোহিমিয়ান ললিতা

দেবী। আমার এই যাযাবর প্রকৃতি ছেলেবেলা থেকে পাগলা ঘোড়ার মত কাশ্মীর থেকে কন্যকুমারীকা পর্য্যন্ত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি! ঘরে আমাব মন বসে না। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারি না। অন্তরঙ্গতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিশ্রুতি তাই আমি দিতে পারি না। এ আমার অক্ষমতা, আমার লজ্জা'

আগনার চাকরী নিশ্চয়ই, আপনার প্রকৃতির অনুগামি আর্থাৎ এই যাযাবর বৃত্তি?

চাকরী? অন্যমনস্ক ভাবে বলল নিখিলেশ হ্যাঁ, খানিকটা তাই। আমাকে চাকরী সূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে হয়। কিন্তু আর না, রাত বাড়ছে, এবার আমাকে যেতে অনুমতি দিন?

ললিতা নিংশব্দে হাত দুটো কপালে তুলল। নিখিলেশ প্রতি নমস্কার জানিয়ে দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হ'ল।

রাত্রে ঘুম আসছিল না শ্রীলার। ললিতা এখনও ফেরেনি। দার্জিলিং-এর বাতাসে আজ হিমের আমেজ নেই। শালটা জড়িয়ে নীচে নামল শ্রীলা। ধীরধাম মন্দিরের চূড়ায় অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। মন্দিরটা যেন মহাকালের অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। নেপালের পশুপতি নাথের মন্দিরের অনুকরণে তৈরী। একটা প্রদীপ জ্বলছে ভেতরে। চবুতরায় দুটো অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। অপরিসীম কৌতুহলে এগিয়ে গেল শ্রীলা।

প্রীতম আর ললিতা। ওরা নীচুস্বরে গল্প করছিল। টুকরো টুকরো কয়েকটা কথা কানে এল শ্রীলার।

আমাকে ক্ষমা করো প্রীতম। নতুন ক'রে জীবন সুরু করার সাহস আমার নেই। ললিতার কণ্ঠ।

এই আত্ম অপচয়ের কোন মানেই হয় না। প্রীতম বলল নিজেকে এভাবে ক্ষয় করার কোন অধিকারই তোমার নেই। প্রীতমের কণ্ঠে এক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হল।

ললিতা বলল, তুমি আমাকে দুর্বল করে দিও না প্রীতম। আমার সব কথা শুনলে তুমি হয়ত আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। ললিতার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ।

প্রীতম বলল, 'ভালবেসে আমিও তো ঠকেছি কিন্তু তবু নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। একটা দুঃস্বপ্নের মত ব্যথার স্মৃতিকে আঁকড়ে রেখে সারা জীবনটা মরুভূমি হয়ে যেতে দিইনি। আমরা প্রত্যেকেই বাঁচতে চাই। কারণ বেঁচে থাকারই নাম আনন্দ।

কিন্তু আমার হৃদয় বলে কিছু নেই। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

মিথ্যে কথা। তোমার অগ্নিসংস্কার হয়েছে। দুঃখের আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়েছে তোমার হৃদয়। আমি তোমাকে সুখী করতে পারব না প্রীতম। আমার ভালবাসার উৎস শুকিয়ে গেছে। আমি খুলে দেব তার ধারা। হৃদয় কখনও নিঃস্ব হয় না ললিতা। হৃদয়ের ভাণ্ডার অফুরান।

আমাকে ফিরে যেতে দাও প্রীতম। আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমি তোমাকে জড়াতে চাই না।

শ্রীলা অনুভব করল ললিতার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। প্রীতম আরও ঘন হয়ে বসল ললিতার পাশে।

তোমার দুঃখ আমি বুঝি ললিতা। তাই তোমাকে কাছে পেতে চাই। আমি হয়ত তোমার চেয়েও কাঙ্গাল। একদিন নিজেকে নিঃশেষে আর একজনের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এবার জীবনের পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠবে। কিন্তু কোথা থেকে কি হ'য়ে গেল। সে হারিয়ে গেল জনারণ্যে। আর তাকে আমি খুঁজে পেলাম না।

প্রীতমের কণ্ঠ বাষ্পাকুল।

মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমিও যে ক্লান্ত। আমাকে বার বার দুর্বল করে দিও না।

এবার ললিতা সত্যিই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। প্রীতমের কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ললিতা।

মধ্যরাত্রিতে দুটি রিক্ত হৃদয়ের এই বারতার সাক্ষী রইল শুধু শ্রীলা আর ধীরধাম মন্দিরের বিনিদ্র দেবতা।

যাবার সময় হল বিহঙ্গের। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই দার্জিলিং ছেড়ে যাবে শ্রীলা। ললিতা ভোরেই কালিম্পং চলে গেছে। যাওয়ার আগে শ্রীলা জিগ্যেস করেছিল ললিতাকে।

কবে ফিরবি কলকাতায়?

জানি না।

হঠাৎ কালিম্পং যাওয়ার সখ কেন?

শেষ খেলা খেলতে।

প্রীতম নিশ্চয়ই ঠকাবে না।

পুরুষ জাতটার উপরে ঘেন্না ধরে গেছে শ্রীলা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। বার বার ভাবি, আর নয়। নিজেকে এ ভাবে ক্ষয় করব না আর। কিন্তু বার বার ছুটে যাই একই খেলা খেলতে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, মনটা মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু।

ললিতার জীবনের আর এক পুরুষের নাম প্রীতম। ভাগ্যের খেলায় পরাজিতা ডানাভাঙ্গা বিহঙ্গী এবার জীবনের পাত্র তুলে দিয়েছে আর এক ফুরিয়ে যাওয়া মানুষের হাতে।

শ্রীলা আশ্চর্য্য হয়। ভালবেসে মানুষ বার বার ঠকেছে। কিন্তু সৃষ্টির আদিম মানুষ-মানুষীর আত্ম অবাধ্যতার নেশা আজও রক্তের মধ্যে প্রবহমান।

তাই বার বার ঠকেও ললিতারা ভালবাসে। শ্রীলার মত নিভ্রেয়েদের সব আদর্শবাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

প্রীতমেরথার মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপর সমতলের মেয়ে আবার ‑লে ফিরে যাবে। এই বন্ধুর উপত্যকায় পাইন আর

পপলারের শাখায় শাখায় ছড়িয়ে থাকবে অনেক স্মৃতি, অনেক বেদনা।

ধীরধাম মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। অজস্রলোকের ভীড়। গতকাল রাত্রির কথা মনে পড়ল। প্রীতম আর ললিতা। ওরা নতুন করে ভালবেসেছে। স্বপ্ন দেখেছে ভালবাসার। দুটি যাযাবর পাখী এবার নীড় বাঁধবে কোন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ বৃক্ষের শাখায়। আবেশে শ্রীলার চোখও বুজে আসে।

শ্রীলাকে ট্রেনে চড়িয়ে দিতে এসেছিল নিখিলেশ।

জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে নিখিলেশের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল শ্রীলা।

দার্জিলিং-এর এই দিনগুলি আমি ভুলব না, শ্রীলা বলল।

নিখিলেশ জবাব দিল না। শুধু শ্রীলার হাতের উষ্ণতার মধ্যে নিজেকে অনুভব করল।

আমার কথা তোমার মনে পড়বে? আবার জিগ্যেস করল শ্রীলা। রাজধানীর অনেক চেনামুখের আড়ালে তোমার ক্ষণিকের বান্ধবী হারিয়ে যাবেনা তো ?

নিখিলেশের কণ্ঠ গাঢ় হয়ে উঠল আবেগে আমি নিজেই যে হারিয়ে গেছি শ্রীলা।

আবেশে শ্রীলার চোখদুটো বুজে এল। চিঠি দিও, শ্রীলা বলল।

ট্রেন ছাড়বে এবার। হাতটা সরিয়ে নিল নিখিলেশ। খোলা জানালা দিয়ে খানিকটা তুষার শ্রীলার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু তারও মাঝে বেশ বোঝা যাচ্ছে শ্রীলার দু'চোখের কোণে দুটি মুক্তো কিন্তু কুয়াশার কণিকা নয়। দুটি অশ্রুবিন্দু।

কিন্তু সেকি দার্জিলিং ছেড়ে যাওয়ার বেদনায় ?

দীর্ঘদিন পরে শ্রীলার কলকাতা ফিরে আসায় বাড়িতে খানিকটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। বৃদ্ধ অধ্যাপক অসমাপ্ত অধ্যায়টা নিয়ে বসে

ছিলেন। শ্রীলা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাতেও ধ্যান ভঙ্গ হল না। শুধু চুরুটের ছাইটা মাত্র খানিক আগে দিয়ে যাওয়া ভর্তি চায়ের পেয়ালার ওপর অন্যমনস্ক ভাবে ঝাড়লেন। চায়ের পেয়ালায় বোধহয় এক চুমুকও দেওয়া হয়নি। পেয়ালাটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখল শ্রীলা। তারপর বলল বাবা, আমি ফিরে এসেছি।

অধ্যাপক চোখ তুলে তাকালেন। আরে শ্রীলা, কখন ফিরলে?

এইমাত্র।

এতদিন পরে ছেলেকে মনে পড়ল?

তুমি যে কি বলো বাবা। দার্জিলিং-এ গিয়ে শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। দার্জিলিং-এর আকাশে যখন সূর্য উঠত তখন মনে হত এবার তোমার গায়ে শালটা ভাল করে জড়িয়ে দেওয়া দরকার। আবার যখন রাত্রিতে জানালার শার্শীতে কুয়াসা জমত, তখন মনে হত এবার আলো না নিভিয়ে দিলে তুমি শুতে যাবে না।

দার্জিলি-এ ভাল ছিলে তো? অসুখ-বিসুখ করেনি?

না-না, অসুখ বিসুখ করবে কেন। শ্রীলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, দেখছ না, কত মোটা হয়েছি এই কদিনেই।

যাক। তুমি ফিরে এসেছো, নিশ্চিন্ত হলাম। ভারী চিন্তা হয়েছিল।

শ্রীলা হেসে বলল, তাই বুঝি। তোমার চিন্তা করবার সময় কোথায়। রাতদিন কেবল পড় আর লেখ। আমি ভাবি, তুমি যখন ছাত্র ছিলে, তখন কি করতে?

তখন কিন্তু একদম উল্টো ছিলাম। ফাঁকি দিতাম, পড়াশুনা একদম করতাম না। তখন শুধু গান গল্প, হাসি, ফুর্তি—বৃদ্ধ অধ্যাপক অতীতের সমুদ্রে ডুব দিলেন স্মৃতির মুক্তো আহরণ করতে। কত আনন্দই না ছিল ছাত্র জীবনের সেই দিনগুলি। তাই বোধ হয় আজ বুড়ো বয়সে না পড়ার শাস্তি ভোগ করছি দিনরাত বইএর উপরে চোখ রেখে।

তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না দার্জিলিং থেকে তোমার জন্য কি এনেছি ?

কি ? ব্রজবিলাস চোখ তুলে তাকালেন।

একটি গোমেধ।

উল্লসিত হলেন ব্রজবিলাস। ওটা দিয়ে একটা আংটি তৈরী করিয়ে আঙ্গুলে পরবে। গোমেধ শুধু দেখতেই সুন্দর নয়। অনেক কুগ্রহের কোপ থেকেও রক্ষা করে।

কিন্তু আমি তো এনেছি তোমার জন্য। তুমি বলেছিলে—

হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম। আমি তোমার জন্যই বলেছিলাম।

শ্রীলা আর কিছু বলল না অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। দীর্ঘ পথযাত্রার শ্রান্তিতে চোখ দুটো জুড়িয়ে আসছে শ্রীলার।

অধ্যাপক তাঁর অসমাপ্ত অধ্যায়ে মনোনাবেশ করলেন পুনরায়।

বারান্দায় মেজ বৌদির সঙ্গে দেখা হল। মেজ বৌদি শ্রীলার মুখের পানে তাকিয়ে হাসল। শ্রীলা জানে এই চাপা হাসি গভীর অর্থব্যঞ্জক।

হাসলে যে ? তবুও জিজ্ঞেস করল শ্রীলা।

মেজ বৌদি, অর্থাৎ শ্রীলার মেজদা সুধন্যর স্ত্রী, যার বাপের বাড়ির চলাত নাম ঝুমকো, কলেজের নাম মনিকা, আবার মুখ টিপে হেসে বলল না, এমনি।

তোমার ঐ বেয়াড়া হাসির মানে আমি জানি,। এ নিশ্চয়ই তোমার কোন. বদ মতলব।

তুমি সাতভাই চম্পার পারুল বোন। তোমার ওপর বদ মতলব ফলাবে এমন সাধ্য কার।

তাহলে বলো, হাসলে কেন ?

হাসিটা কি কারো কাছে বাঁধা দিয়েছি ?

শ্রীলা বিরক্ত হয়ে বলল, তাহলে মরো তোমার হাসি নিয়ে, আমি যাচ্ছি।

যাও না, আমি তো ধরে রাখিনি।

কিন্তু শ্রীলা গেল না। হঠাৎ অসীম মনোযোগের সঙ্গে বারান্দায় রাখা ফুলের টবগুলো দেখতে লাগল। তারপর উচ্ছসিত হয়ে বলল, দেখেছ মেজ বৌদি, চন্দ্রমল্লিকাগুলো কি বিরাট হয়েছে।

মেজ বৌদি সহসা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে শ্রীলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ছোট, তোমার কি হয়েছে বলো তো?

শ্রীলা ভয় পেয়ে বলল, কই, কিছু না তো।

এই ফুলপ্রীতি তো তোমার আগে ছিল না।

শ্রীলা আমতা আমতা করে বলল হ্যাঁ, মানে না, ঠিক তা নয়, ফুলগুলো হঠাৎ কেমন যেন ভাল লেগে গেল।

উদাস কণ্ঠে মেজবৌদি বলল, কখনও কখনও সব কিছুই ভাল লাগে। হঠাৎ, অকারনেই।

শ্রীলার মনটা কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেল। মেজবৌদি একবার আড়চোখে শ্রীলার দিকে তাকিয়ে তোয়ালেটা বুকে জড়িয়ে শ্লিপার ঘষতে ঘষতে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল।

শ্রীলা ভাবছিল তাহলে কি মেজবৌদি জানতে পেরেছে? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? দার্জিলিং-এর কথা কলকাতায় বসে টের পাওয়া সম্ভব নয়। অন্ততঃ মেজবৌদির পক্ষে তো নয়ই, ঘর আর সংসারবই যে কিছু জানে না। তবে অপরের মনের কথা অনুমান করার আশ্চর্য শক্তি আছে মেজবৌদির। এবং তাহলে কি—শ্রীলা হয়ত অনেক কিছুই ভাবত কিন্তু তার আগেই ওকে ঘিরে ধরল মনিকা, শম্পা, বুলবুল আর বাচ্চু, ওদের ফরমাইসি জিনিসের জন্য।

শ্রীলা সুটকেস খুলে ওদের জিনিসগুলো বার করল। ওরা জিনিসগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

একটা স্নিগ্ধ সুবাস ছড়িয়ে স্নান সেরে ফেরার পথে মেজবৌদি পুনরায় তেমনি চাপা হাসি হেসে বলল, ভাই ছোট, কিছু হারিয়ে আসোনি তো?

না, সবই ফিরিয়ে এনেছি।

যা হারিয়ে এলে আর ফিরে পাওয়া যায় না?

শ্রীলা অবুঝের মত মেজবৌদির মুখের পানে তাকিয়ে বলল, মানে?

মানে হৃদয়। দার্জিলিং তো শুনেছি বিকিকীনির হাট। সেখানে পথে পথে মন দেয়া-নেয়া।

শ্রীলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু মেজবৌদির কণ্ঠে এমন একটা স্নেহ ও প্রশ্রয়ের আভাস ছিল যা অভিভূত করল শ্রীলাকে, এবং শ্রীলা ভাবল একমাত্র মেজবৌদিব কাছেই বলা যায় সব সুখ অথবা দুঃখের কথা।

মেজ বৌদির বুকে মুখ লুকিয়ে ফিস ফিস করে শ্রীলা বলল জানি না।

কিন্তু ছোট, ভারী মুস্কিলে ফেললে তুমি। এদিকে তোমার অন্যত্র বর খোঁজা হচ্ছে।

পাত্রটি কে?

ঊর্মিলার দেওর।

কথা ফিরিয়ে নাও বৌদি, শ্রীলা মিনতি করল। মেজ বৌদি পরিপাটি করে চুল বেঁধে শ্রীলার কাছে এসে বসল। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কি তার পরিচয় ছোট?

শ্রীলা নতমুখে বলল, পরিচয়, জানি না।

মেজবৌদি ভ্রূ কুচকে শুধোল, কেন?

আমি জানতে চাইনি।

কিন্তু আমাদের তো প্রয়োজন রয়েছে তার পরিচয় জানার। কি চাকরী করে, বাড়ি কোথায়, এগুলো তো সঙ্গত কারণেই জানা দরকার।

কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিল হৃদয়ের পরিচয়ই তো শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

মেজ বৌদি বলল, দেখ ছোট, প্রেমে আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি প্রশ্ন, সে প্রশ্নটি নিরাপত্তার। পুরুষদের কাছে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ আশ্রয়ের এবং মেয়েদের কাছে বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি, এই দুই-এ মিলে প্রেম। রেসকোর্সে বাজী জেতার অন্য নাম প্রেম নয়। কাজেই তুমি যদি তার পরিচয় না নিয়ে থাকো, তাহলে অন্যায় করেছ। ঠিকানা জানো?

তা জানি, শ্রীলা বলল। শুধু নামটুকু এবং সাকিন। পরিচয় নেই।

বেশ তোমার দাদাকে বলব মেজ বৌদি বলল।

শ্রীলা মিন মিন করে বলল এখনি বলার কি দরকার?

ঊর্মিলার দেওরের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধের প্রস্তাবটা নাকচ করার জন্য তো বলা দরকার। নাকি ও থাকবে ওয়েটিং লিস্টে?

শ্রীলা শুধু হাসল।

এবং অতএব ঊর্মিলার দেওরের সঙ্গে শ্রীলার সম্বন্ধের কথা আর বেশীদূর এগোল না। ব্রজবিলাস মাথা চুলকে মেজ ছেলে সুধন্যকে বললেন, তাই তো সুধন্য, এখনি না করে দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? বিশেষত শ্রীলার মনোনীত পাত্রটি সম্বন্ধে আমরা যখন বিশেষ কিছুই জানি না।

একদা সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র সুধন্য বলল অবস্থাটা আজকাল আর কেউ দেখে না বাবা। সামাজিক মর্য্যাদার প্রশ্নটা এখন আর বড় নয়। পুরুষকারই একমাত্র পরিচয়। তাছাড়া শ্রীলার কথায় মনে হ'ল ভদ্রলোক ভাল চাকরীই করেন।

যা ভাল বোঝ করো। ব্রজবিলাস ইতিহাসের পাতায় মন দিলেন।

সুধন্য বেরিয়ে এল। কারণ সুধন্য জানে ব্রজবিলাস মিতভাষী। প্রয়োজন না হলে কথা বলেন না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাও

বলেন না। বড়দা মানে সুনন্দ যখন ষ্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত পড়তে যায় তখন মাত্র একটি কথায় মতামত ব্যক্ত করেছিলেন ব্রজবিলাস।

দেশে কি আর উচ্চশিক্ষার কোন সুযোগ নেই?

আছে বৈকি। সুনন্দ বলেছিল কিন্তু সে শিক্ষার পরিধি অত্যন্ত সীমিত। তাছাড়া জ্ঞানের সঙ্গে অভিজ্ঞতা না যাচাই করে নিলে জ্ঞান যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়। অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি প্রয়োজন। আমাদের দেশে জ্ঞানলাভের অবকাশ আছে প্রচুর কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গে জ্ঞানকে মিলিয়ে নেবার সুযোগ হয়ত সব সময় নেই।

ব্রজবিলাস সুনন্দর কথাগুলো শুনছিলেন মন দিয়ে। ওর কথার মাঝে কথা বলেননি একটিও। সুনন্দর কথা শেষ হওয়ার পর বলেছিলেন, ভারতবর্ষের পরিসর অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে বিশাল বলেই আমার প্রত্যয়। অবশ্য আমার এই প্রত্যয়কে বিশ্বাস করাবার জন্য তোমাকে কোন যুক্তি আমি দিতে পারব না। আমার ধারণা তোমার বিশ্বাস এর ঠিক উল্টো। কাজেই যেখানে তোমার ও আমার মতামতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এবং যেখানে আমরা দুটো ভিন্ন দিক দর্শনে বিশ্বাসি সেখানে রফা, অর্থাৎ কম্প্রোমাইজের কোন পথ নেই।

তাহলে কি আমার বিলেত যাওয়ায় আপনার মত নেই? সুনন্দর কণ্ঠে ক্ষোভের সুর।

মতামতের প্রশ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু তুমি যদি আমার অনুমতির কথা বলো সেখানে তোমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে আমি হস্তক্ষেপ করব না। তবে যদি প্রিন্সিপল্-এর কথা বলো সেখানে আমি নীরব থাকব, কারণ নীরব থাকাই নিরাপদ।

সুনন্দও আর কথা বাড়ায়নি। বিলেত যাওয়ার সব প্রস্তুতি করেছিল নীরবে। এবং যাওয়ার দিন প্রণাম করতে গিয়েছিল ব্রজবিলাসকে। আজই যাচ্ছো নাকি? ব্রজবিলাস বলেছিলেন।

ওঁর কণ্ঠে ছিল না অভিযোগের আভাস অথবা অভিমানের উত্তাপ। পূর্ব আলোচনার সূত্রধরে তিক্ততার সৃষ্টি করেননি। সুনন্দ প্রণাম করতেই ওর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, সাবধানে থেকো। নিয়মিত চিঠিপত্র দিও।

এবং সুনন্দ যেদিন চিঠিতে জানিয়েছিল যে সে একজন বিদেশিনীকে বিয়ে করতে চায় সেদিনও ব্রজবিলাস এতটুকু বিচলিত হননি। সুনন্দ চেয়েছিল অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ। ব্রজবিলাস শুধু লিখেছিলেন পুত্র হ'য়ে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার চির আশীর্ব্বাদেয় অধিকারী হয়েছো তুমি। আর অনুমতির কথা লিখেছ, আমি অনুমতি না দিলে কি তুমি নিরস্ত হবে? এই লৌকিকতার বোধ করি কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে তুমি ফিরে এসে স্বজাতির (স্বজাতি এই অর্থে, যে ভারতবাসী মাত্রই আমার স্বজাতি) মেয়েকে বিয়ে করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হত এবং আর একটি ভারত-বাসীর অবিমিশ্র বংশের ধারা অব্যাহত থাকত।

সুনন্দ বিয়ে করেছিল এবং বিয়ের পর ওর আর ওর বিদেশিনী স্ত্রীর একটা ফটোও পাঠিয়েছিল। ফটো ব্রজবিলাসের ঘরেই টাঙ্গানো আছে। কিন্তু সুনন্দ আর ফিরে আসেনি। ওর বিদেশে অবস্থান কাল শেষ হয়েছে বহুদিন। একটি পুত্রও জন্মলাভ করেছে সেখানে। কিন্তু সুনন্দ ফেরেনি। মাঝে মাঝে সুনন্দের ছবিটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ব্রজবিলাস। চশমার কাঁচটা রুমাল দিয়ে মোছেন বার বার আর ভাবেন সুনন্দ কি কোনদিনই ফিরবে না।

ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব মতামতের অগ্রাধিকার দেন ব্রজবিলাস। যদি নিতান্তই তাঁর আজীবন লালন করা আদর্শের সঙ্গে সংঘাত না বাধে। ব্রজবিলাস বিশ্বাস করেন যুগের সঙ্গে মত বদলায় এবং মত ও মতবাদ দুটোই আপেক্ষিক।

সুধন্য জানতো সে কথা। শ্রীলাও জানতো। জানতো বলেই হয়তো নিখিলেশের সঙ্গে শ্রীলার অন্তরঙ্গতা দার্জিলিং-এর স্বল্প

অবকাশেও নিবিড় হয়ে উঠেছিলো। বাইরে দাঁড়িয়ে ব্রজবিলাসের সঙ্গে আলোচনার ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করছিল মেজবৌদি।

সুধন্য বেরুতেই মুখটীপে হেসে মেজবৌদি বললো, উর্ম্মীলার দেওরের সঙ্গে সম্বন্ধটা তাহ'লে—

হ্যাঁ কেঁচেই গেল।

উর্ম্মীলাকে জানানো দরকার।

অবশ্যই, সুধন্য বলল, একটু পূর্বভাস দিলেই চলবে।

অর্থাৎ ? মেজবৌদি জিজ্ঞেস করলেন।

অর্থাৎ পরিতোষকে পছন্দের ব্যাপারে যেমন উর্ম্মীলার মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল তেমনি শ্রীলার মতামতটাকেও অগ্রাহ্য করা সম্ভব হল না। এবং বাবার মতামত উভয় ক্ষেত্রেই এক।

মানে ? মেজবৌদি আরও প্রাঞ্জল ভাষায় শুনতে চায়।

মানে আবার কি, বাবার মতামত নিরপেক্ষ।

মেজবৌদি আশ্বস্ত—হ'ল।

উর্ম্মীলার বিয়ের আগেও এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল। সুধীন সান্যাল ব্রজবিলাসের বন্ধুপুত্র। পরিতোষ সুধন্যর বন্ধু। দুজনার সঙ্গেই পরিচয় ছিল উর্ম্মীলার। কিন্তু শুধু পরিচয় মাত্র। ব্রজ-বিলাসের ইচ্ছে ছিল সুধীনের সঙ্গে উর্ম্মীলার বিয়ে দেবার। কিন্তু উর্ম্মীলার ইচ্ছে ছিল পরিতোষকে বিয়ে করবার। কোনদিন কোনো অলস মুহূর্তে স্বল্প পরিচিত পরিতোষের সঙ্গে নীড় বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল কিনা সে কথা উর্ম্মীলারও মনে নেই। কিন্তু সুধীন ও পরিতোষ এর মধ্যে পরিতোষকে বেছে নিতে দ্বিধা করেনি। পরিতোষ আজ পুরুলিয়ার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। এবং উর্ম্মীলা সুখী হয়েছে। নিঃসন্দেহে সুখী।

শ্রীলাও সুখী হবে। শ্রীলাও সুখী হোক, মেজবৌদি ভাবল। কারণ উর্ম্মীলা দীর্ঘদিন মাতৃস্নেহ উপভোগ করেছে। আর শ্রীলা ? যখন মায়ের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী, যিনি ওর আশা ও

আকাঙ্খার পথগুলো চিনিয়ে দিতে পারতেন তাঁকে সে কৈশোরের সুরুতেই হারিয়েছে। স্বল্পদিনের বিরতির পর এ বাড়ীতে এসেছে মেজোবৌদি। যিনি আজ নামটুকু হারিয়ে সম্বোধনটুকু পরিনতি করে নিয়েছেন। কুমারী জীবনের ঝুমকো নয়, কলেজ জীবনের মনিকাও নয়, এমন কি বিবাহিত জীবনের পোষাকী পরিচয় মালবিকা মিত্রও নয়, শুধুই মেজোবৌদি।

সেই আনন্দেই মেজবৌদি পরিতৃপ্ত। শ্রীলাকে পাখী মা-এর মত পাখনার আড়ালে ঢেকে রেখে এত বড়টি করে তুলেছেন সেই শ্রীলার বিয়ে।

মেজবৌদির মনটা আবেশে ভরে উঠল। শ্রীলা যখন পছন্দ করেছে, তখন সে পুরুষ নিশ্চয়ই পুরুষোত্তম। শ্রীলার পছন্দব ওপরে আস্থা আছে মেজবৌদির, তবু মন বড় বৈরী। মাঝে মাঝে একটা আশঙ্কা উঁকি মারে। সত্যিই কেমন হবে সে পুরুষ।

শ্রীলার জীবনের পরম পুরুষ সেই পুরুষটি। নিখিলেশ যার নাম।

বৈশাখের দমকা বাতাসের মত, অথবা চৈত্রের ঘূর্ণি হাওয়ার মত সবকিছুকে তুচ্ছ করে আকাশে উড়িয়ে দেবার মত যার ঔদার্য্য, ঝর্ণার মত মুক্ত অবাধ যার গতি, জীবনটা যার কাছে শুধু মাত্র থ্রীল, এবং থ্রীল, তার নাম সুনীত। ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। শ্রীলার ছোড়দা। সুনীত লাইফ ইন্স্যুরেন্সে চাকরী করে বর্ধমান ব্রাঞ্চে। নিজের গাড়ী আছে। উদ্দাম গতিতে গাড়ী চালায়। স্পীডের কাঁটাটা মিটারের শেষ প্রান্তে থরথর করে কাঁপে। বর্ধমান থেকে কলকাতার নির্দিষ্ট পথযাত্রার সময়কে অর্ধেক সংক্ষেপিত করে বাড়ী আসে সুনীত। তখন বাড়ীটা যেন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে। আবার যখন ফিরে যায় তখন যেন কেমন নিঃঝুম হয়ে পড়ে। ঝড়ের পরে প্রকৃতি শান্ত হয়ে পড়লেও যেমন ক্ষণপূর্বের রুদ্ররূপ মনের মধ্যে

দোলা দেয়, তেমনি এ বাড়ীর সবাইকার মনের মাতন ঝিমিয়ে পড়লেও একেবারে স্তিমিত হয় না। বেগের আবেগ যেন মনটাকে ঈষৎ পীড়িত করে মৃদু যন্ত্রণার মত।

উর্মিলা আর সুধন্য, যারা দীর্ঘদিন ধরে মায়ের স্নেহ আর মমতা ভোগ করেছে তারা সুনীতের মধ্যে তাদের হারিয়ে যাওয়া মায়ের আদল খুঁজে পায়। শুধু চেহারায় নয় প্রকৃতিতেও। মাও নাকি ঠিক এমনি ছিলেন। উর্মিলা বলে, এমনি আকাশের মত নিঃসীম, উদার। দুঃখকে হাসি দিয়ে ঢেকে রাখবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল মায়েরও।

ব্রজবিলাসেরও বিশ্বাস তাই। ব্রজবিলাস মাঝে মাঝে সেই কথাই ভাবেন।

শ্রীলা দার্জিলিং থেকে ফেরার পর আজই প্রথম কলকাতায় এল সুনীত।

রাস্তার মোড়ে গাড়ীর হর্ণ শুনেই বোঝা যায় সুনীত আসছে। দমকলের গাড়ীর মত অবিশ্রাম হর্ণ বাজিয়ে পাড়ার লোককে সচকিত করে বাড়ী আসে সুনীত। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসে। আনন্দে হাততালী দিয়ে ওঠে।

সুনীতের গাড়ীর হর্ণ শুনে শ্রীলাও বাইরে এসে দাঁড়ায়। শ্রীলার দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সুনীত, আরে, ছোট যে! দার্জিলিং-এ কদিন থেকেই তুই যে ফর্সা হয়ে গেছিস।

অভিমানহত শ্রীলা বলল, আমি বুঝি কালো? শ্রীলার আহত হবার কারণ আছে। শ্রীলা শ্যামলী।

সুনীত হো-হো করে হেসে বলল, আমি কি আর তাই বলেছি। তুই হচ্ছিস যাকে বলে উজ্জ্বল মেঘবর্ণ। অর্থাৎ—

থাক, আর ভাষ্য করতে হবে না।

তা দার্জিলিং-এ কেমন কাটলো বল।

আগে ভেতরে চলো। বাইরে দাঁড়িয়ে কি আর কথা হয় নাকি?

তোদের এই প্রটোকলগুলো আমি এখনও ঠিক রপ্ত করতে পারিনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলা নিষিদ্ধ। বেশি গোপন কথা হলে রান্নাঘরের কোণে গিয়ে বলতে হবে—আরে, মেজ গিন্নী যে।

মেজ বৌদি আঁচল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

থাক আর আঁচল দিয়ে হাত মুছতে হবে না। আমি বুঝেছি।

কি বুঝেছো ?

বুঝেছি এই যে তুমি আজকাল কাজ করছ।

আজকাল মানে ? আগে করতুম না বুঝি ?

আমি কি তাই বলেছি নাকি ? আজ কিন্তু বৌদি তুমি বসে বসে নভেল পড়ছিলে। আমার গাড়ীর আওয়াজ শুনে রান্নাঘরে গিয়ে শাড়ীতে খানিকটা হলুদ লাগিয়ে হাতটা একবার ডালের মধ্যে নেড়ে আঁচল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলে। ভাবখানা এই যে কত কাজ করছো।

মেজ বৌদি গুমরে উঠল। না, কিছুই করি না তোমাদের বাড়ীতে। তোমার দাদা বসিয়ে বসিয়ে খেতে দেয়।

বসিয়ে বসিয়ে কেন ? দিনের মধ্যে বিশবার ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো আর গালে পাউডারের পাফ বুলোনোতে কষ্ট নেই বুঝি ? তারপর শাড়ী পরা, সিনেমা দেখা এবং মেজদার সঙ্গে ঝগড়া করা, এসব তো আছেই। কতো কাজ তোমার !

হেসে ফেলল মেজবৌদি। নেপথ্যে ব্রজবিলাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সুনীত এসেছে বুঝি ?

এই রে, বাবা টের পেয়েছেন। মেজবৌদি তুমি জিনিস গুলো ভেতরে নিয়ে যেতে বলো। আমি এক্ষুনি আসছি। সুনীত প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

সব শুনে সুনীত বলল, তাই তো মেজবৌদি, এবার তো আমাকেও কিছু একটা করতে হয়, না হ'লেই মেজদার মত ভাল ছেলে হয়ে প'ড়ব।

মেজবৌদি চটে উঠলেন কেন, তোমার মেজদা ভাল ছেলে হ'য়ে কি মন্দ বৌ এনেছেন ?

না তা নয়, তবে কিনা, মেজবৌদির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সুনীত বলল, তোমার চেয়ে কালো মেয়ে কি আর ভূভারতে ছিল না।

রাঙ্গা টুকটুকে বৌ আনলেই পারতে, ঝাঁঝিয়ে উঠল মেজবৌদি।

তাহ'লে যে মেজদার মত সুদুর্লভ পাত্র তোমার হাত ছাড়া হয়ে যেত—।

মেজবৌদি নির্লিপ্তকণ্ঠে বললেন সে ভাবনা তোমাদের ভাবতে হত না ভাই।

সুনীত হেসে ফেলল। এ ওদের নিত্যকার খুনসুটী। কিন্তু এখন তো অন্য ভাবনা ভাবতে হচ্ছে মেজবৌদি। শ্রীলা ভিন্ন এ বাড়ীর অন্য কেউ নিখিলেশকে দেখেনি। অবশ্য শ্রীলার পছন্দর ওপর আমাদের আস্থা রয়েছে। তবুও নিখিলেশকে একবার দেখা প্রয়োজন কিনা ভেবে দেখো।

কিন্তু তাকে পাচ্ছো কোথায়। সে তো এখন দিল্লিতে।

কি চাকরী করে জানো না কি ?

মেজবৌদি ঘাড় নাড়ল। সে খবরও অজানা।

এতো অত্যন্ত চিন্তার কথা। ঠিকানা জানো।

হ্যাঁ। দিল্লীর একটা হোটেলের ঠিকানা।

বেশ তো, শ্রীলা একবার ওকে আসতে লিখে দিক না। দু'চার দিন আলাপ টালাপ করে দেখি, কি রকম রুচি, কি রকম পছন্দ, তারপর লাইফ ইনসিওরেন্স আছে কিনা, থাকলে কত টাকার এবং সেটা তার পক্ষে কম অথবা বেশী—

জোরে হেসে উঠল সুনীত। মন্দ সম্ভাবনার আকাঙ্খাটা যেন শেকড় শুদ্ধু উপড়ে ফেলতে চাইল।

সেই ভাল। মেজবৌদি সায় দিল। সুনীতের কথায়, শ্রীলা নিখিলেশকে লিখে দিক। পত্রপাঠ চ'লে আসুক নিখিলেশ।

অথবা এক কাজ করলেও হয়, একটা বিকল্প পরামর্শ দিল সুনীত, আমাদের সবজান্তা ভূবন কাকাকে লিখে দিলেও হয়। দিল্লীতে কিছুই অজানা নেই ভুবন কাকার। তিনি খোঁজ খবর নিয়ে জানাতে পারেন।

এ পরামর্শটা ঠিক পছন্দ হয় না মেজবৌদির। অবশ্য ভূবন কাকা দিল্লী শহরেব দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। সেখানকার তাবৎ বাঙালী তাঁকে একডাকে চেনে। তাঁর উপচিকীর্ষা এবং বাঙ্গালী-প্রীতি সর্বজনবিদিত। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করল মেজবৌদি। নিখিলেশ এ কথা জানতে পারলে হয়ত অখুশী হবে।

না, ভূবন কাকাকে এখন না জানানোই ভাল। ভূবন কাকাকে জানানো আর দিল্লীর শহরে ঢাক পিটোন একই কথা। তাছাড়া ভূবন কাকাতো খুব মেজাজী লোক। হয়ত হোটেলে গিয়ে নিখিলেশকে প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসায় ব্যতিবস্ত করে তুলবেন। তার চেয়ে শ্রীলাই লিখে দিক নিখিলেশকে এখানে আসতে।

ভুবন কাকার কথা বলে সুনীতও খানিকটা অস্বস্তী বোধ করছিল। কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা ওকে পীড়িত করছিল। সুনীতের বিশ্বাস যেন জোর পেল মেজবৌদির কথায়। তাছাড়া, সুনীতও ভাবল, দেখা দেখির ব্যাপারগুলো নিতান্তই লৌকিক। অন্তত যেখানে পূর্বরাগের একটা আভাস আছে। তবু, এই পূর্বরাগটা খাঁটি কিনা সেটা পরখ্ করে দেখা প্রয়োজন। সেই জন্যই শ্রীলা আর নিখিলেশকে বাড়ীতে কদিন একসঙ্গে দেখতে চায়। মেজ-বৌদিও সেই কথাই ভাবল। সন্ধানী দৃষ্টির কাছে প্রেমের গভীরতা

নির্নীত হতে আর কতখানি সময় লাগবে? কতখানি সময় লাগবে শ্রীলার আর নিখিলেশের অন্তরঙ্গতা নিরুপণ করতে?

তাছড়া, মেজবৌদি আরও ভাবল নিখিলেশ শ্রীলার আহ্বানে সাড়া দেবেই। দিল্লী কতই বা দূর। একটি ভ্রমর একটি পুষ্পিত ফুলের কাছে পাখনা মেলে কত দূর দুরান্ত থেকে উড়ে আসে সে খবর কি মেজবৌদি জানে?

কাজেই, নিখিলেশ কি আসবে না?

শ্রীলার মনেও ওই একই প্রশ্ন। নিখিলেশ কি আসবে না? কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্য্যোদয়ের বর্ণালী, সে কি শুধু ক্ষনিকের? যে বর্ণালীর ছোঁয়ায় রঙীন হয়েছিল সমতলের দুটী হৃদয়, তাকি ফিকে হয়ে যাবে দুদিনেই?

কি ভাবছো ছোট, মেজবৌদি শুধোলেন।

শ্রীলা। কিছু না তো।

মেজবৌদি। ভাবলেই বা দোষ কি?

শ্রীলা। না দোষ নেই। কিন্তু ভাবনার কি আর অন্ত আছে। মন যে সমুদ্র।

মেজবৌদি। আজ থেকে ন' বছর আগে বললে হয়ত এই দুরূহ তত্ত্বের জবাব আমি দিতে পারতাম।

শ্রীলা। এখন।

মেজবৌদি। (দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে) এখন শুধু নিজেরে হারায়ে খুঁজি।

ন বছর আগের সব কথা স্পষ্ট মনে পড়ে না শ্রীলার। অনেক কথার মানে বুঝত না তখন। অনেক ইঙ্গীত অস্পষ্ট রয়ে যেত মনের মাঝে। সেসব দিনের একটা আবছা স্মৃতি যেন চোখের সামনে মাঝে মাঝে কাঁপে। তখন ক্ষনে ক্ষনে উজ্জ্বল আর উচ্ছল হয়ে উঠত মেজবৌদি। কথায় কথায় চোখের পাতা কাঁপত থরথর করে।

গাল দুটো রক্তিম হয়ে উঠত, কখনও লজ্জায়, কখনও অনুরাগে। কিন্তু—শ্রীলার মনে হল অকস্মাৎ, মেজবৌদির শরীরে কি রক্ত কমে গেছে আজকাল ?

হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিই তো ভবিষ্যতের সঞ্চয়। জীবনে যখন সব স্বাদ ফুরিয়ে যায় তখন শুধু ঘ্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাকা। মনের নিভৃতে অতীতের সোনালী স্মৃতি জমা থাকে হিসেবের খাতায় উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের মত। তখন সম্বল শুধু স্বপ্ন। স্বপ্ন শুধু অতীত। সেই অনাগতদিনের জীবিত মৃত্যুর ছায়ায় শঙ্কাতুর শ্রীলা সে কথা ভাবতে চায় না আর। এখন বরং শ্রীলা দুদন্ত দার্জিলিং-এর কথা ভাবতে পারে, ভাবতে পারে নিখিলেশের কথা। তাই শ্রীলা নিখিলেশের কথা ভাবলো। আনন্দ পেল, এবং তখনই মেজবৌদি জিজ্ঞেস করল।

নিখিলেশকে চিঠি দিয়েছ ?

শ্রীলা বলল না, এখনও লিখিনি।

দেরী ক'র না, মেজবৌদি বলল, যৌবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি পল অনুপল পর্য্যন্ত মূল্যবান। একটি মুহূর্তের দেরীও যৌবনের প্রান্তদিনে অসীম অপচয়ের মত মনে হবে। এটা ভাবের আবেগ নয়; অঙ্কের হিসেব।

শ্রীলা চোখ তুলে মেজবৌদির মুখের পানে তাকালো। মেজ-বৌদি শ্রীলার মাথায় হাতদিয়ে ছোটমেয়ের মত আদর করে বললেন, আর দেরী কোর না। ওকে আসতে লিখে দাও।

শ্রীলা ঠিক করল নিখিলেশকে ও চিঠি লিখবে এবং আজই।

কিন্তু লিখতে বসে সব এলো মেলো হ'য়ে যেতে লাগল। যেন একটা জট পাকানো সুতোর বাণ্ডিল। ছাড়াতে গেলেও ক্ষণে ক্ষণে জড়িয়ে যায়। মনের কথা গুলো কলমের গোড়ায় এসে শূন্যে মিলিয়ে যায়। শুধু লজ্জাই নয়, একটা দুরন্ত সঙ্কোচের বাধা শ্রীলার পত্র রচনার প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে লাগল বারবার। এবং

অবশেষে পত্র রচনা সমাপ্ত করে শ্রীলা দেখল নিতান্তই কাজের কথা অর্থাৎ নিখিলেশকে আমন্ত্রণ জানানো ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারেনি ও। অব্যক্ত কথার ভার ওর ভাষাকে হরন করে নিয়েছে। শ্রীলা শুধু লিখেছে—এ-বাড়ীর সকলেই তোমাকে দেখার জন্য উন্মুখ। তাঁরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, আলাপ করে সুখী হতে চান, এবং চোখ দিয়ে পরখ করতে চান আমার পছন্দকে। অতএব, তুমি কি আসবে না?

কিন্তু শ্রীলার প্রতি মুহূর্তের আশঙ্কা, কোথাও কাঙ্গালপনা প্রকাশ পায়নি তো ওর চিঠিতে? যদি দীনতার লজ্জায় নত হয়ে থাকে ওর আহ্বান, আর যদি সে আহ্বানে নিখিলেশ সাড়া না দেয়, তাহ'লে সে লজ্জা কোথায় রাখবে শ্রীলা?

হৃদয় নয় একটি ভীরু ভীরু প্রাণের স্পন্দন। স্বপ্ন নয়, যেন দূরাগত স্মৃতির মৃদু সৌরভ। আশায় লালিত একটি দীপশিখা শ্রীলার হৃদয়ে জ্বলে অনির্ব্বান।

মেয়ে নয়, যেন ললিত লবঙ্গলতা, বলতেন শ্রীরামপুরের রাণী মাসীমা। শ্রীলার বয়স তখন কতই বা হবে, সাত কিংবা আট? প্রজাপতির মত ফুর ফুর করে উড়ে প্রজাপতি ধরবার বয়স তখন। হাসি আর কান্নার ছুটো সহজ কৌশলে নিপুনিকা ছিল শ্রীলা। একবার একটা পাতাবাহারের মত প্রজাপতি ধরেছিল শ্রীলা। উর্ম্মীলা তার একটা পাখনা ছিঁড়ে দিয়েছিল। মায়ের কাছে অনুযোগ করতে এসেছিল শ্রীলা। ওর ছু চোখ ভরা জল। রাণী মাসীমা হেসেছিলেন। বাগানে তো আর প্রজাপতির অভাব নেই। যা না বাপু আর একটা ধর গিয়ে।

ঠিক সেই রকমটি পাবো কোথায়, কান্না ভরা গলায় শ্রীলা বলেছিল।

তখনই শ্রীলাকে নতুন নামে ডেকে ছিলেন রাণী মাসীমা। ললিত লবঙ্গলতা। সেইদিন থেকে নতুন নামটাই স্থায়ী হয়ে গেল।

সেইদিন থেকে শ্রীলাও প্রজাপতি ধরা বন্ধ করে দিয়েছিল। আর রাণী মাসীমার কথাটাও বাড়ীময় প্রচার হয়ে গিয়েছিল। ললিত লবঙ্গলতা। তারপর থেকে শ্রীলা কোন কারনে অভিমান করলে অথবা কারো নামে অনুযোগ করলে সবাই তাকে ওই নামেই ডাকত ওর কান্না বন্ধ করবার জন্য অন্ততঃ। এবং বস্তুত তখন থেকই কান্না ভুলেছিল শ্রীলা।

আজ যেন শ্রীলার মনে হল ও কান্নার বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্রজবিলাস মনোযোগের সঙ্গে কি যেন পড়ছিলেন। শ্রীলা নিঃশব্দে ব্রজবিলাসের পিছনে এসে দাঁড়াল তারপর তাঁর শুভ্র কেশে বিলি কাটতে লাগল। শ্রীলার উপস্থিতি তাঁর চেতনাকে সজাগ করল না। তাঁর মন এখন সুদূরে। কিসের সন্ধানে ঘুরে ফিরে একটি অন্বেষী মন, ব্রজবিলাস নিজেও তা জানেন না। শুধ্ কখনও কোন শীতের রাত্রে, যখন দক্ষিনের উতলা বাতাস জানালার পর্দাকে এলোমেলো করে দেয়, বাগান থেকে ভেসে আসে একটা সোনালী গন্ধ, তখন যেন অতীতের পথ বেয়ে কে এসে দাঁড়ায় অধ্যাপকের পাশে। হঠাৎ ঘুম ঘুম চেতনার মধ্যে মনে হয়, কে যেন ছিল, কে যেন নেই—অধ্যাপক জানালার কাছে এসে তারাভরা আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। একটু একটু করে অন্ধকার সরে যায়। তারা গুলো হারিয়ে যায় ভোরের আলোয়। রাত্রির ছায়ায় ম্লান ইমারত গুলো ঝলমলিয়ে ওঠে। আর অধ্যাপক একটা স্বপ্নের জগৎ থেকে নিজেকে ফেরৎ পান তাঁর চার দেওয়ালের মাঝে, যেখানে আজ থেকে বিশবছর আগে কেউ ছিল, আজ নেই।

শ্রীলার ভাঙ্গা চুলের মিষ্টি গন্ধ নাকে যেতেই অধ্যাপক চমকে উঠলেন। বহু বিনিদ্র রাত্রির ঘুম ঘুম তন্দ্রার মাঝে এক মুহূর্তের জন্য ফিরে গেলেন অধ্যাপক। কিসের গন্ধ? ল্যাভেণ্ডার? বড় পরিচিত

গন্ধ। শ্রীলাও ওর মার মত রুচি পেয়েছে, অধ্যাপক ভাবলেন। তারপর বুকভরা নিঃশ্বাসে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধটা সঞ্চয় করে নিতে চাইলেন। কিন্তু, শ্রীলা যেন কি ভাবছে?

শ্রীলার মুখের পানে তাকালেন ব্রজবিলাস। শ্রীলা ঈষৎ বিব্রত হল।

ভাল লাগছিল না বাবা, তাই শ্রীলা ওর অসময়ে উপস্থিতির জন্য অজুহাত দিতে চাইল।

ব্রজবিলাস ঈষৎ হাসলেন। তার জন্য কুণ্ঠা কিসের?

শ্রীলা আরও কুণ্ঠিত হয়ে বল্লল না তুমি হয়ত ভাববে হঠাৎ কেন এলাম।

ব্রজবিলাস বুঝলেন একটা নিঃসীম চিন্তার সমুদ্রে শ্রীলা দিশা খুঁজে পাচ্ছে না।

আমার কাছে আসার জন্য এতো দ্বিধা কেন। যখন খুশি আসবে। যখন তখন আসবে।

এবার শ্রীলা একটু সহজ হবার চেষ্টা করে। তাই বুঝি, যখন তখন এলে তুমি বিরক্ত হবে না? তুমি তো রাতদিনই পড়ছ, শুধু পড়া আর পড়া; কি এতো পড় বলতো? আমারতো বই দেখলেই কান্না পায়।

আমারও কান্না পেত, অধ্যাপক বল্লেন, বই যখন পাঠ্য বই হিসেবে থাকে না, তখন বেশ ভাল লাগে, কিন্তু তা পাঠ্য হলেই তা দুষ্পাঠ্য হয়ে ওঠে। এটাই নিয়ম।

শ্রীলা ব্রজবিলাসের টেবিলটা গোছাতে লাগল। শ্রীলা এই অসহনীয় চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। বেশ হত যদি একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘুমুতে পারত শ্রীলা। তারপর কোন একদিন প্রত্যুষে উঠে দেখতে পেত বাইরে পোষ্ট অফিসের দূত দাঁড়িয়ে, তার হাতে নীল খাম। প্রিয় বারতা এবং তার মধ্যে নিখিলেশর হৃদয়ের উত্তাপ মাখানো একটী পত্র। কিন্তু এ শুধু কল্পনা।

অলীক কল্পনা। এবং পৃথিবীতে অনেক কল্পনাই সত্যি হয় না। কিন্তু যদি নিখিলেশের কোন খবর না আসে, যদি না আসে কোন বার্ত্তা, কোন সমাচার, তাহলে? ম্রিয়মান হল শ্রীলা। ব্রজবিলাস লক্ষ্য করলেন শ্রীলাকে।

ব্রজবিলাস। শ্রীলা তুমি কিছু ভাবছ?

শ্রীলা। না তো।

ব্রজবিলাস। আমার কাছে লুকিও না।

শ্রীলা। হ্যাঁ আমি ভাবছি।

ব্রজবিলাস। বাধা না থাকলে আমার কাছে বলতে পারো। আমি তোমার বাবা। তোমার বন্ধু। তোমার শ্রেষ্ঠ শুভাকাংক্ষী।

শ্রীলা। আমি ভাবছি নিখিলেশের কথা।

ব্রজবিলাস। নিখিলেশের কথা ভাবার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু দুর্ভাবনা মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়।

কিন্তু আমি চিন্তা না করে পারছি না। শ্রীলার কণ্ঠ অত্যন্ত অসহায় শোনায়। অথৈ জলে প্রাণপণ সাঁতার কেটেও যেন কূল পাচ্ছে না শ্রীলা।

পৃথিবীতে অনেক দুঃখ আছে, কিন্তু আনন্দও আছে অনেক। যদি ভাবতে শেখ সব কিছুই সত্য ও সুন্দর তাহলে দুর্ভাবনা তোমাকে কষ্ট দেবে না।

আমি অত্যন্ত আশঙ্কার মধ্যে রয়েছি, শ্রীলা বলল। শ্রীলা ভরসার আশায় ব্রজবিলাসের দিকে তাকাল।

কিসের আশঙ্কা? ব্রজবিলাস প্রশ্ন করলেন।

নিখিলেশের জন্য আমার আশঙ্কা হচ্ছে।

অধ্যাপক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে, শ্রীলা বলল, যদি কোন খবর না আসে?

এ রকম আশঙ্কা করার কোন কারণ নেই। প্রত্যয়হীনতা দুর্বল মনের লক্ষণ।

শ্রীলা অনেক আশ্বস্ত হল। বুক থেকে যেন একটা পাষাণ ভার নেমে গেল শ্রীলার। এই মুহূর্তে শ্রীলার মনে হল নিখিলেশকে ও বিশ্বাস করে।

মনের মধ্যে জমে ওঠা সব মেঘ ব্রজবিলাসের আশ্বাসের শীতলতায় বৃষ্টির মত ঝরে পড়ে। শ্রীলার সব বেদনা আর চিন্তার জঞ্জালগুলো যেন দূর হয়ে যায়। শ্রীলা উড়ুক্কু মাছের মত চঞ্চল হয়ে ওঠে, তারপর দরজার প্রায় কাছাকাছি গিয়ে বলে আমি যাচ্ছি বাবা।

ব্রজবিলাস চোখ তুলে তাকান এবং শ্রীলার এই হঠাৎ খুশির পরশ লাগে ওর মনের মধ্যেও। ব্রজবিলাস হঠাৎ বাইরের দিকে তাকালেন। দেখলেন নীল নির্মেঘ আকাশে অসংখ্য জল-পায়রা চক্র দিয়ে উড়ছে।

বৃদ্ধ ব্রজবিলাস থেকে শুরু করে এ বাড়ীর কনিষ্ঠতম মানুষ অর্থাৎ সুধন্যার ছোট্ট মেয়ে রিতার ওপরও যাঁর সমান আধিপত্য তাঁর নাম রাণী মাসীমা। শ্রীরামপুরেয় রাণী মাসীমা। রাণী মাসীমা সমানে হাসতে পারেন, হাসাতে পারেন এবং কথা বলতে পারেন এবং অপরকেও বলতে বাধ্য করেন। রাণী মাসীমার আলাপের আসরে ছোটবড় ভেদ নাই।

গেটের কাছেই জমাদারনীর সঙ্গে দেখা হল রাণী মাসীমার।

রাণী মাসীমা। কিরে, তোর গেঁটে বাতের ব্যথা সারল?

করুণ মুখে জমাদারনী বলে, ও কি আর সারবার অসুখ মা। চিতায় না উঠলে সারবে না। আপনি আছেন কেমন তাই বলুন।

বেঁচে আছি কোন রকমে। রাণী মাসীমা বলেন। কিন্তু আশ্চর্য, রাণী মাসীমাকে দেখে মনে হয় না কোন দুঃখ আছে অথবা থাকতে পারে রাণী মাসীমার মত মানুষের মনের মধ্যে। রাণী মাসীমার শরীরে কোন অসুখ নেই। একটি নিখুঁত সুচারু দেহ।

উত্তর চল্লিশের মাঝামাঝিতে পৌঁছেও কি এক নিপুণ কৌশলে বয়সটাকে মধ্য তিরিশের কোঠায় থমকে রেখেছেন রাণী মাসীমা।

বারান্দায় এ বাড়ীর পুরোন ঝি-এর সঙ্গে দেখা হল রাণী মাসীমার। শুভদার মা, তুমি এখনও বেঁচে আছো দেখছি? রাণী মাসীর চোখে বিস্ময়।

শুভদার মায়ের শরীরে আদি ব্যাধির উপস্বর্গগুলো একসঙ্গে দেখা দিল। একে কি আর বাঁচা বলে মা, এই দেখ না, দুটো চোখেই ছানি পড়েছে, তারপর দাঁত ব্যথা, তারপর—

ফিরিস্তীর সোনার সময় নেই। রাণী মাসীমা থামিয়ে দিয়ে শুধোল, তোমার ছেলের বৌ-এর বাচ্চা হয়েছে?

কই আর হল মা, ভাবছি এবার শেষবারের মত কল্যাণেশ্বরীতে মানত দিয়ে দেখব।

মাসীমা কথা বলতে বলতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন শুভদার কথা শুনে ফিরে দাঁড়ালেন, যদি মানত করেও না হয়?

শুভদার মা চুপ করে থাকে।

তাহলে ছেলের আর একটা বিয়ে দেবে না? ও মতলবটি করো না শুভদার মা। আর যদি নিতান্তই করো, তাহলে তোমার ছেলেকে ডাক্তার দেখিও। তোমাকে নাতির মুখ দেখানোর যোগ্যতা আছে কিনা তোমার ছেলের সে কথা ডাক্তারই বলে দেবে।

এ বাড়ীতে রাণী মাসীমার আসাটা কোন উপলক্ষ্য দ্বারা চিহ্নিত নয়।

রাণী মাসীমা যখন তখন আসেন। অধ্যাপক ব্রজবিলাসের স্ত্রী যশোমতী যখন বেঁচে ছিলেন তখন ঘন ঘন আসতেন। এখও আসেন তবে আগের তুলনায় আসেন কম। যশোমতী ভালবাসতেন রাণী মাসীমাকে। আর রাণী মাসীমা তো তাঁর বড় মেয়ে উর্মীলারই বয়সি।

রাণী মাসীমা যার অপর নাম খুশি এবং যশোমতী বেঁচে থাকতে

ব্রজবিলাস যাঁকে খুশিয়ালী বলে ডাকতেন, তিনি সত্যিই খুশিয়ালীর একটি ঝর্ণাধারা। এ বাড়ীতে যখনই আসেন এ বাড়ীর সব কটা লোক খুশির হাওয়ায় পাখনা মেলে ভেসে বেড়ায়। এমন কি শ্রীলা, যে মেয়ে চোখ তুলে তাকাতে পারত না, মুখ তুলে কথা কইতে পারত না, প্রাণ খুলে হাসতে পারত না, যে মেয়ে সদাই বিষণ্ণ থাকত একটা অজানিত আশঙ্কার ছায়ায়, সেই মেয়েও খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠত। যেন কান্নার উপকূলে দাঁড়িয়ে আনন্দের উত্তাল সমুদ্রে হারিয়ে যেত শ্রীলাও। রাণী মাসীমার কণ্ঠ একটা শুভ দিনের ইসারা। সবাই একসঙ্গে ছুটে এল। চীৎকার করে উঠল রাণী মাসীমা—রাণী মাসীমা।

সকলের পিছনে শ্রীলা ও মেজবৌদি এসে দাঁড়ায়। সুনীতও এসেছিল সেদিন। রাণী মাসীমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে সুনীত। কীর্তনের সুরে গেয়ে ওঠে, আজি বহুদিন পরে, মাসীমা আসিল ঘরে—

'আকাশে উঠিল যেন চাঁদ' রাণী মাসীমা সুরে সুরে সুনীতের কথার পাদপূরণ করে বললেন, তা তোদেরও মাসীমা, তোদের ছেলে-মেয়েদেরও আমি মাসীমা নাকি ?

সুনীত বলল, জানো মাসীমা, কতকগুলো আত্মীয়তার সম্বোধন আছে, সেগুলো সার্বজনীন। যেমন চাঁদ মামা, মা কালী, মা দুর্গা, ইত্যাদি। আবার কতকগুলোর উপরে কিছুই নেই। যেমন ঠাকুরদার বাবা। ঠাকুমার মা, ইত্যাদি। তুমি ওদের ঠাকুমা বলবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে পারো, তবে পঁয়তাল্লিশ বছরের ঠাকুমা, দুনিয়ার তাবৎ ঠাকুমাদের একটা ক্ষোভের কারণ হতে পারে।

লেকচার দিসনে। রাণী মাসীমা বলেন, তা কতজনের জীবন হানি এবং কতজনের জীবন সংশয় করলে এই কদিনে।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, কতজনের লাইফইনসিওর করলে এবং কতজনের লাইফ

হেল্‌ করলে সেইটাই জানতে চাইছিলুম আর কি। রাণী মাসীমা বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করেন।

মুখ শুকনো করে সুনীত বলে, আর বলো কেন মাসী। মানুষ-গুলো আজকাল বেজায় চালাক হয়ে গেছে। জীবনটাকে যেন দুহাতে আগলে নিয়ে বেড়ায়। আমাদের পাল্লায়, আই মীন, আমাদের খপ্পরে, মানে আমাদের শুভবুদ্ধির এক্তিয়ারে, বহুবার শুধরে কথাটা শেষ করে সুনীত, জীবনটাকে সুরক্ষিত করবার জন্য আমাদের কাছে কেউ আসতেই চায় না।

শ্রীলা গম্ভীর মুখে বলে, ছোড়দা এবার লাইন পেয়েছে।

শ্রীলার মাথায় একটা আল্‌তো গাঁট্টা মেরে সুনীত বলল, তুই থাম। আমার কথাটা এখনও শেষ হয়নি। এ বছর লাখ বিশেক টাকার কেস করেছি রাণী মাসীমা।

রাণী মাসীমা চোখ কপালে তোলেন, তাহলে তো সারা বাংলা দেশই তোর কবলায়িত।

হ্যাঁ মাসী, একমাত্র তুমি ছাড়া। কত করে বললাম একটা জয়েণ্ট লাইফইনসিওর করে নাও। যে রেটে মোটা হচ্ছ তাতে কোনদিন যে টেঁসে যাবে বলা যায় না।

মেজবৌদি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, আহা, কথার কি ছিরি। আপনি ওপরে চলুন মাসীমা।

ছোট, জামাইবাবু কোথায় রে?

ওপরের ঘরে।

অধ্যয়ণ না অধ্যাপনা।

এখন কিছুদিন ধরে অধ্যয়ণ ও অধ্যাপণাই, দুই চলছে।

যাক, তাহলে দুদণ্ড গল্প করা যাবে।

সে হবে'খন। মেজবৌদি বলল, আগে আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প-সল্প করে তারপর বাবার কাছে যাবেন।

. তাও কি হয়, রাণী মাসীমা বলেন, অন্তত দেখাটা করে আসি।

তারপর শ্রীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছোট, তোর খবর কি? শুনলাম তোর নাকি নতুন খবর আছে?

শ্রীলার গাল ঈষৎ লাল হল লজ্জায়। জবাব দিতে গিয়ে ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। রাণী মাসীমা শ্রীলার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা ফিরে এসে শুনব।

রাণী মাসীমা একটি বিদ্রোহিনী নারী। কেউ ভাবতেও পারেনি নবদ্বিপের রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়ে এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন রাণী মাসীমা। রাণী মাসীমার মা-বাবা তো নয়ই। এমন-পাড়াপড়শীরাও নয়। অব্রাহ্মণ সংস্কৃত পণ্ডিত নবগোপাল কাব্য-তীর্থের আধুনিকতার প্রতি কোন বিরাগ ছিল না। কিন্তু স্বাদেশিকতাও ছিল। একদা বিলিতী বর্জন করেছিলেন। তিরিশ সালের সত্যাগ্রহেও যোগ দিয়েছিলেন এবং তখন কয়েকটি দিন কেটেছিল বৃটিশ সরকারের কারাগারে। তা সত্বেও নতুন দিনের প্রতি বিরাগ ছিল না। রাণী মাসীমাকে তাই শিক্ষায়-দীক্ষায় মনের মত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন পণ্ডিত নবগোপাল। সনাতন আর আধুনিকের মধ্যে যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু অশুচি, বর্জন করে, যা কিছু গ্রহণীয় তাই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত কাব্যে দীক্ষা দিয়েছিলেন বাড়ীতে তারপর কনভেণ্টেও পড়িয়েছিলেন। শিব স্তোত্র, চণ্ডীপাঠ শিখিয়ে ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল ক্লাবেও মেম্বর করে দিয়েছিলেন রাণী মাসীমাকে। একদা রাইফেল ক্লাবে অব্যর্থ লক্ষ্য বলে সুনামও কিনেছিলেন রাণী মাসীমা।

কিন্তু এসব সত্বেও একদিন পণ্ডিত নবগোপাল কাব্যতীর্থের সঙ্গে বিরোধ ঘটল রাণী মাসীমার। আদর্শ ও মতবাদের সংঘাতে। ভালবাসার মত একটি হৃদয় বৃত্তিই জয়ী হল শেষ পর্যন্ত। রাণী এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করলেন।

সেদিন একমাত্র ভরসা ছিলেন ব্রজবিলাস। আবার যেদিন নতুন করে সংঘাত বাধল মহীতোষের সঙ্গে, তখনও একমাত্র ভরসা ব্রজবিলাস।

উৎসব, ব্যসন, দারিদ্র্য ও দুঃখের দিনের একমাত্র বন্ধু।

রাণী মাসীমা তাই ব্রজবিলাসের কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

রাণী মাসীমার মনের গভীরে বেদনার একটি ক্ষীণ ধারা বয়ে চলেছে সর্বদা। ভুলেও যা রাণী মাসীমা কোনদিন প্রকাশ করেন না। আর সেই সন্তর্পণ গোপনীয়তার প্রয়াস যাতে শিথিল না হয়ে পড়ে তাই এই উচ্ছলতার নির্মোকে নিজেকে আবৃত করে রাখেন রাণী মাসীমা। যা তাঁর বয়সের তুলনায় হয়ত নিতান্তই বেমানান।

নিঃশব্দে ব্রজবিলাসের চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়ালেন রাণী মাসীমা। যশোমতীর ফটোর নীচে ফুলদানীতে কয়েকটি তাজা রজনীগন্ধার গুচ্ছ। একটা আলতো সুবাস ছড়িয়ে আছে সারা ঘরময়। এই ঘরে এলেই মাঝে মাঝে পুরোন দিনের কথা মনে পড়ে রাণী মাসীমার। আর রাণী মাসীমার লোহার বর্ম দিয়ে ঘেরা বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। রাণী মাসীমার আপাত উচ্ছল মনটা সেই মুহূর্তে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। তখন—

তখন ভারী কান্না পায় রাণী মাসীমার।

প্রেম ভালবাসা প্রণয়—রাণী মাসীমার মাঝে মাঝে মনে হয় সব ভুল, সব মিথ্যে। অপরিণত বয়সের চাপল্য। রোম্যান্টিক মনের কল্পনা বিলাস।

যশোমতী বলতেন, মনের মধ্যে একটা কষ্টিপাথর আছে, মনের মানুষকে সেখানে যাচাই করে নিতে হয়।

তাহলে কি রাণী মাসীমা মহীতোষকে যাচাই করে নেননি? সে মহীতোষ আজও তাঁর স্বামী, যাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আরাম ও আয়েসের জন্য রাণী মাসীমার উৎকণ্ঠার অন্ত নেই?

যশোমতীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে মনে হয় রাণী মাসীমার

শ্রীলা ঠিক মায়ের আদলটা পেয়েছে। তেমনি ছলছল মুখ, টলটলে চোখ যেন একটু আঘাতেই ভেঙ্গে পড়বে। তেমনি হাসি।

অধ্যাপক ব্রজবিলাস পিছন ফিরে তাকালেন। রাত্নু কখন এলে? ধীর স্বরে বললেন ব্রজবিলাস। যশোমতীর মৃত্যুর পর আজকাল আর প্রায়ই রাণী মাসীমাকে খুশিয়ালী বলে ডাকেন না ব্রজবিলাস। যশোমতীকে ভুলতে গিয়ে আজ অনেক কিছুই ভুলে গেছেন।

নতুন নামে ডাকছেন? রাণী মাসীমা বললেন।

পুরোন সব কিছুই তো একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়। গীতায় পড়নি, 'বাসাংসি জীর্ণাণি।'

এতদিন পরে আপনার কাছে গীতায় ভাষ্য শুনতে আসিনি জামাইবাবু, সংসারের সুখ-দুঃখের খবরা-খবর জানতে এসেছি।

কিন্তু আমি তো বহুপূর্বে সংসারের ভার ছেড়ে দিয়েছে। এখন গৃহেই আমার বাণপ্রস্থ।

তাহলেও, এ বাড়ির কোন কাজই তো আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়নি। আর হয়ে থাকলেও তো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আপনি নিঃশেষ করে দিয়েছেন। কাজেই কোন বিশেষ খবর থাকলে তা নিশ্চয়ই আপনার, মানে এ বাড়ীর কর্তার জানা থাকবে।

অধ্যাপক ব্রজবিলাস একটু স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন। সেই সঙ্গে ভাবলেন রাণীকে আজকাল ক্রমেই অত্যন্ত দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। তাহলে কি পারিবারিক সমস্যাটা অত্যন্ত গুরুতর ভাবে দেখা দিয়েছে?

তারপর বললেন আমি তো স্মরণ করতে পারছি না রাত্নু। কিন্তু কি এমন কারণ যার জন্য তুমি পর্য্যন্ত পূর্বে এসেছো?

রাণী মাসীমা ভূমিকা আর দীর্ঘ করলেন না। শুধু বললেন শ্রীলা নাকি দার্জিলিং-এ একটি ছেলেকে পছন্দ করেছে। সে নাকি দিল্লীতে এ্যাম্বাসি অফিসে চাক্‌রী করে?

অধ্যাপক মাথা চুলকে বললেন, সব খবর তো আমি জানি না। তবে সম্প্রতি দার্জিলিং-এ নিখিলেশের সঙ্গে শ্রীলার পরিচয় হয়েছিল। এবং ছেলেটি ভাল।

এ বিষয়ে আপনার মতামত আপনি জানিয়েছেন?

হ্যাঁ। শ্রীলার স্বপক্ষেই অবশ্য। এ বাড়ীর আর সকলেরও ওই একই মত।

রাণী মাসীমা চুপ করে রইলেন।

অধ্যাপক জিগ্যেস করলেন কিন্তু তোমার মত কি রান্নু। রাণী মাসীমা ম্লান হাসি হাসলেন। আমার আর মত কিই শ্রীলা সুখী হলেই আমার সুখ। কিন্তু—কথাটা বলতে গিয়ে সহসা থেমে গেলেন রাণী মাসীমা।

কিন্তু কি? অধ্যাপক জিগ্যেস করলেন।

রাণী মাসীমা নত কণ্ঠে বললেন প্রেম-ভালবাসায় আমি আস্থা হারিয়ে ফেলেছি জামাইবাবু। আমার মন সাড়া দেয় না।

অধ্যাপক রাণী মাসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা বেদনার ছায়া লক্ষ্য করলেন। চোখের তারায় লক্ষ্য করলেন যন্ত্রণার আভাস। অধ্যাপক বললেন দেখো রান্নু পৃথিবীতে এমন দুজন লোক তুমি খুঁজে পাবে না যাদের মনগুলো একই উপাদান দিয়ে তৈরী। কাজেই যেখানে দুজন মানুষকে একটি সংসার তৈরীর দায়িত্ব নিতে হয় সেখানে সাম্য প্রয়োজন অন্যথায় বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। আর, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা তো শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের সম্পর্ক নয়।

রাণী মাসীমা মুখ নীচু করলেন। মহীতোষের জন্য রাণী মাসীমা সব কিছু ত্যাগ করে এসেছিলেন। মহীতোষও কম লাঞ্ছনা সহ্য করেননি রান্নু মাসীমার জন্য। ওদের ভালবাসায় ফাঁকি ছিলনা কোথাও। কিন্তু কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল। আজ তাঁদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ন্যূনতম সম্পর্কটুকু মাত্র রয়েছে।

রাণী মাসীমা যশোমতীর ফটোটার পানে তাকিয়ে রইলেন।

রাণী মাসীমার বাবা রাণী মাসীমার এই অবাধ্যতা ক্ষমা করতে পারেন নি। রাণী মাসীমা যেদিন বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিলেন সেদিন একটি কথাও বলেননি বৃদ্ধ। শুধু উঠে গিয়ে শক্ত হাতে দরজাটা বন্ধ করেছিলেন। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে ছিলেন। আবাল্যের সংস্কারকে তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন রাণু যা করেছে তাই ঠিক। যুগ এগিয়ে চলছে। যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু পুরাতন সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। একদিন নতুনদের হাতেই তুলে দিতে হবে এই পৃথিবীর দায়িত্ব। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন জেগেছিল বৃদ্ধের মনে তাহলে কি আজ যা আধুনিক একদিন তাকেও পুরাতন বলে সরে যেতে হবে? তাহলে কি পুরাতন মানে অপ্রয়োজনীয়, অচল? হয়তো হবে। বৃদ্ধ পণ্ডিত পুরাতন ও নতুনের সমন্বয় ঘটিয়ে একটা আদর্শ মতবাদ মনের মধ্যে পোষণ করেছিলেন। কিন্তু হেরে গেছেন তিনি। একটা উপমা মনে পড়েছিল তাঁর। মনে হয়েছিল তিনি যেন ভাঙ্গা গাড়ীর সওয়ার। চলেছেন সামনের দিকে কিন্তু দৃষ্টি রয়েছে পেছনে। যার জন্য আধুনিকতার প্রতি মমতা থাকলেও রাণুকে সমর্থন করতে পারেননি পণ্ডিত নবগোপাল।

এবং এই কথাটা রাণী মাসীমারও মনে হয়েছিল অনেকদিন পরে। কিন্তু সে কথা ভেবে আজ লাভ কি? সেদিন জীবনের সবটাই ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে।

চোখে সেদিন অনেক স্বপ্ন ছিল, হৃদয়ে অনেক আশা। আর আজ? অতীত শুধু ইতিহাস। ভবিষ্যতের তোষাখানায় প'ড়ে আছে মাত্র কয়েকটা খুচরো দিন। রাণী মাসীমা অপচয়ের অন্ধকারে হারিয়ে ফেললেন নিজেকে।

অথচ এই রাণী মাসীমা, যাঁর বুকের মধ্যে বেদনার ফল্গুধারা নিয়তই প্রবহমান, তিনি যখন আর সবাইয়ের সঙ্গে কথা বলেন

তখন মনেই হয় না পৃথিবীর কোন দুঃখ কোন ব্যথা তাঁকে স্পর্শ ক'রতে পারে। রাণী মাসীমা যখন উচ্চকণ্ঠে হাসেন তখন মনে হয় তাঁর শরীর বুঝি শুধু হাসি দিয়েই তৈরী। রাণী মাসীমা যখন অনর্গল কথা বলেন তখন মনে হয় ঝর্ণার স্বতস্ফুর্ততা এর কাছে ম্লান। আবার যখন অপরের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করেন তখন কল্পনাও করা যায় না ইনি ইচ্ছে করলে মধ্য প্রাচ্যের কোন গুরুতর রাজনৈতিক তত্ত্ব অথবা সীমান্ত বিরোধের কোন জটিল সমস্যার ওপরও আলোচনা করতে পারেন অনায়াসে। রাণী মাসীমা একটি কুহেলিকার মানুষ।

রাণী মাসীমার এরিয়াটা বিশাল। একই ভাষায় তিনি শ্রীলা মেজ বৌদি এবং সুনীতের সঙ্গে কথা বলেন। মাঝে মাঝে তাই সকলকেই অত্যন্ত বিব্রত হতে হয়। কিন্তু রাণী মাসীমা নির্বিকার।

কি ছোট, তুই নাকি আজকাল প্রেম করছিস?

লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে ওঠে শ্রীলার মুখ।

রাণী মাসীমা লজ্জিত নন আদৌ। বললেন বাংলা ভাষায় জিগ্যেস করলাম তাতে তুই ব্লাশ করছিস, যদি ইংরেজী করে বলতাম তুই আজকাল কোর্টশিপ করছিস তাহ'লে বোধহয় তোর চোখের পাতা নড়ত না প্রজাপতির পাখনার মত।

তারপর মেজ বৌদিকে ধরেন। কিরে মেজ, তোর চেহারাটা যেন কেমন কেমন দেখছি—

বললেন, না মাসীমা। যা চর্বি জমেছে শরীরে—

আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে!

সন্দেহ, কিসের সন্দেহ? মেজ বৌদি আঁতকে ওঠে।

না, আমি জানতে চেয়েছিলাম, তোমার বুঝি কোন নতুন খবর আছে।

নতুন খবর এই বয়সে?

সুনন্দর চিঠি পেয়েছে? ওকি বিদেশেই থাকবে চিরটা-কাল?

বোধহয়। আসার তো আশা দেখি না। এই তো সেদিনও চিঠি লিখেছেন বাবাকে।

জামাইবাবু আসবার জন্য লেখেন না?

তিনি আসবার জন্য লিখবেন না। আর ছেলেও দুরন্ত অভিমানী। না লিখলে কিছুতেই আসবে না।

রাণী মাসীমা এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন বাপ-মার চেয়ে ছেলেমেয়েদের জেদটাই বেশি হয়।

একটা বেদনার ছায়ায় হারিয়ে যেতে যেতেও সামলে নিলেন রাণী মাসীমা।

শ্রীলা গেল কোথায়?

শ্রীলার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন রাণী মাসীমা। বারান্দায় আইভী লতাটা দুলছে বাতাসে। ক্রোটনের পাতাগুলো শির শির করে কাঁপছে। একটি মৌমাছি লতানে গোলাপের চারপাশে ঘুরছে। শ্রীলা রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সহসা ঘরে ঢুকলেন রাণী মাসীমা। জবাব না দিয়ে চ'লে এলি যে?

শ্রীলার মুখের রক্তিম আভা অস্তরাগের সঙ্গে মিশে একাকার হ'য়ে গেল।

মাসি তুমি যেন কি। সবই তো জেনেছ।

তবু তোর মুখে শুনতে চেয়েছিলাম। কারণ একটা কথা জানার ছিল।

কি কথা?

ললিতা কি ভদ্রলোকের সঙ্গে তোর পরিচয় করে দিয়েছিল?

না।

তোর সঙ্গে পরিচয়ের ব্যাপারে ললিতার কি কোন হাত ছিল? প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ?

একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ মাসী?

কারণ ললিতা অনিন্দিতা নয়।

শ্রীলা বলল, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় নিতান্তই আকস্মিক। এতে ললিতার কোন হাত নেই মাসী, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

সে আমি জানিরে ছোট। রাণী মাসীমা শ্রীলাকে কাছে টানলেন। ললিতার জন্য আমার দুঃখ হয়, সুখের আশায় বার বার যাদের কাছে ও ছুটে গেছে তারাই ওকে ঠকিয়েছে। বাঁচতে গিয়ে ম'রে এসেছে। জিততে গিয়ে হেরে এসেছে। অথচ, আমার বিশ্বাস ললিতা নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছে। সকলেই ওকে ঠকিয়েছে, কিন্তু ও কাউকে ঠকায়নি আর—রাণী মাসীমা থেমে থেমে বললেন, ওরা এমনি ক'রেই ঠকায়।

মাসীমার কণ্ঠে ক্ষোভের সুর। সেই ক্ষোভ সেই বেদনার কারণ শ্রীলা জানে। শ্রীলা জানে, রাণী মাসীমার জীবনে একটা করুণ অধ্যায় আছে। সেই বেদনা রাণী মাসীমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে রয়েছে। তবু রাণী মাসীমা কত সহজ আর শ্রীলা একটি চিঠির প্রতীক্ষায় কত উতলা। কিন্তু আজ তো সবে পাঁচ দিন। দিল্লী থেকে কলকাতা কত দূর? কত সময় লাগে চিঠি পৌঁছাতে?

এই অন্যমনস্কতাটুকু লক্ষ্য করেই রাণী মাসীমা বললেন একটা কথা জিজ্ঞাস করব রে ছোট?

শ্রীলা হেসে বলল, অনুমতি চাইছ?

অনুমতি নয়। এতদিন তোকে সত্যি সত্যিই ছোট ভাবতাম। কিন্তু আজ লক্ষ্য করছি তুই বড় হয়ে গেছিস। অনেক অনেক বড়।

তাহ'লে দেরী না ক'রে কথাটা নিঃসঙ্কোচে বলে ফেল।

নিখিলেশ কি ক'রে?

খোঁজ নিইনি।

কেন?

খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি।

কারণ!

আমার সঙ্গে একটি মানুষের পরিচয় হ'য়েছিল। তার হৃদয়ের পরিচয় আমি পেয়েছি। এর চেয়ে বেশি কিছু প্রয়োজন ছিল কি?

কথাগুলো খুব বড়ো বড়ো শোনাচ্ছে না?

শোনালেও আমি নিরুপায় মাসীমা। আমার ধারণা মানুষের হৃদয়ের পরিচয় তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, ক্ষণে ক্ষণে তার রং বদলায় না। আর ব্যবহারিক পরিচয় তো নিতান্তই আপেক্ষিক, এই আছে আর এই নেই। সেখানে জীবিকার মূল্য কি?

জীবনের এই মূল্যায়ণ সম্বন্ধে তোমার থিওরীটা শুনতে মোটামুটি ভালই। কিন্তু যাকে নিয়ে ঘর করবে, যাকে নিয়ে সারাটা জীবন কাটাতে হবে, তার শুধু হৃদয়ের পরিচয়টাই প্রথম ও শেষ নয়। একটি সুন্দর হৃদয়ের সুবাস বুকে নিয়ে সারাজীবন কাটানো যায় এই কি তোমার ধারণা?

ধারণা নয় রাণী মাসী, বিশ্বাস।

শ্রীলা তুমি মরেছ।

শ্রীলা লজ্জিত হ'ল। নিখিলেশ সম্বন্ধে এত কথা আর কারো সঙ্গেই হয়নি। এমন কি মেজ বৌদির সঙ্গেও না। রাণী মাসীমা বয়সের প্রাচীরটা তুলে দিয়ে আলাপকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। তবু আশ্বস্ত হ'তে পারছেন না কেন? মাসীমা কি মানুষের প্রেম প্রীতি ভালবাসার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন? অথচ মহীতোষকে তিনি ভালবেসে বিয়ে ক'রেছিলেন। বাবা মা আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে একদিন যে দুঃসাহসিকা নারী একটি পুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিলেন আজ তিনি হারিয়ে গেছেন। সেই হারানো স্মৃতির ভগ্নস্তুপের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ইতিহাসের স্বাক্ষরের মত।

মাসীমা আবার বললেন কিছু মনে করিস না ছোট। আজ আর কোন কিছুই সহজভাবে নিতে পারিনে। ভালবেসে ঠকে যাওয়ার চেয়ে বড় লজ্জা আর নেই। তখন ঘরে বাইরে গঞ্জনা।

নিজের কাছেও সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এর যন্ত্রণা কি যে নিদারুণ—মাসীমা কথা শেষ করার আগেই একদল ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে ধরল।

মাসীমা তুমি কিন্তু আমাদের একেবারে ভুলে গেছ। ঠোঁট ফুলিয়ে অনুযোগ ক'রল শম্পা।

শম্পার গাল টিপে আদর করে রাণী মাসীমা বললেন ভুলিনিরে বাবা, ভুলিনি। তোদের কি আর ভুলতে পারি।

তারপর পনেরটি দিন পার হ'য়ে গেল। শ্রীলার পত্র এখনও অনুত্তরিত। নিখিলেশের কোন খবর এল না। মেজ বৌদির চোখে স্মিত আশ্বাস। আসবে, ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন।

কিন্তু শ্রীলার অবুঝ মন উৎকণ্ঠার সাগরে ভাসে। দিল্লী থেকে কলকাতা কতই বা দূর? এক পক্ষ কালের মধ্যেও কি একটি চিঠি দিল্লীর বারতা নিয়ে কলকাতা পৌঁছাতে পারে না? এই গতির যুগেও? যখন মানুষ সকালে প্লেনে চ'ড়ে দিল্লী গিয়ে সন্ধ্যায় কাজ সেরে কলকাতা ফিরতে পারে?

শ্রীলার অধীরতা লক্ষ্য করে মেজ বৌদি বলল, তোমায় অত্যন্ত চিন্তিত মনে হচ্ছে?

চিন্তার কারণ কি নেই? শ্রীলা শুধোল।

প্রতীক্ষার সময় কি শেষ হ'য়ে গেছে? মেজ বৌদি বলল।

প্রতীক্ষার সীমা নেই। প্রতীক্ষা অনন্ত।

সে প্রতীক্ষার ফল তুমি পাবেই। অধীর হ'চ্ছ কেন?

অধীর আমি হইনি, শ্রীলা বলল, শবরীর প্রতীক্ষারও শেষ হ'য়েছিল একদিন। কিন্তু সেদিন সে রিক্ত, নিঃস্ব। প্রতীক্ষা করে নিঃস্ব হওয়া যায়, কিন্তু নিঃস্ব হয়ে প্রতীক্ষা করা যায় না। মেজ বৌদি সংসারের কাজে বেরিয়ে গেল। শ্রীলা ভাবতে লাগল। নানান এলোমেলো ভাবনা। চৈত্রের হাওয়ায় এলোমেলো হ'য়ে

ঝরে যাওয়া গুচ্ছ গুচ্ছ শিরীষফুলের মত। নরম মিষ্টি আর বেদনা ভরা টুকরো টুকরো ভাবনা। ম্যাল—ভিক্টোরিয়া ফলস—টাইগার হিল। নীল আকাশ। সাদায় কারুকাজ করা টাই। তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয় শ্রীলা। শ্রীলার কানে বাজে বুদ্ধ মন্দিরের দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি। গির্জার ঘণ্টার একটা আশ্চর্য্য মিল আছে। দুটোই অন্য এক জগতের কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় মানুষ একটি নিঃসঙ্গ দ্বীপ নয়। মানুষ একটি মিতালী মধুর জনপদ। অনেকের মনের মধ্যে যার আনাগোনা। যে অনেকের সুখ দুঃখ ও আনন্দ বেদনার শরিক। শ্রীলার মনে হল সে বুঝি একটা দ্বীপ হয়ে গেছে। অচল সমুদ্রের শিকলে বাঁধা অসহায় একটি ভূমিখণ্ড। ওর মনের সব দুয়ারগুলো যেন রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। বাইরের রূপ রস গন্ধ ভরা পৃথিবীর আকুতি যেন ওর হৃদয় স্পর্শ ক'রছে না। বড় অল্পতেই কাতর হয় শ্রীলা।

অথচ সুনীত। মনের মধ্যে কালবৈশাখীর ঝড় নিয়েও হাসি মুখে কথা বলে। সুনীতের ধৈর্য্য অপরিসীম। সুনীত একটা দুর্জ্ঞেয় হেয়ালী। ওর মনের নাগাল পাওয়া যায় না। সেই অতল অজ্ঞাত মনের গভীরে একদা হারিয়ে গিয়েছিল ললিতা অথচ—অথচ—।

কিন্তু ললিতার দুঃখের কথা থাক। শ্রীলা সুনীতের কথা ভাবল আবার। সুনীত একটি পরিশীলিত রুচির মানুষ। ব্রজবিলাস অন্য ছেলেদের মত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বি. এস. সি. পাশ করার পর আর পড়তে চায়নি সুনীত। ভবিষ্যতে জীবনে প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার জন্য ব্রজবিলাস সুনীতকে ডাক্তারী অথবা এঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজী হয়নি সুনীত। কি হবে আর পড়ে। সুনীত বলেছিল। ভদ্র সমাজে যাতে তোমরা নিতান্তই অপাংক্তেয় না ক'রে দাও, তাই বি. এস. সিটা পাশ করলাম। আসলে,

ওটা শিক্ষা নয়, শিক্ষার আসরে প্রবেশ করার জন্য সামান্য প্রসাধন।

কিন্তু য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রী না থাকলে কি তুমি সভ্য সমাজের ছাড়পত্র পেতে না।

পেতাম। তাতে মর্য্যাদা থাকত না। তোমাদের ভদ্র সমাজের বেয়ারার স্থান আউট হাউসে। পার্লারে নয়। যদিও এরাই সমাজের অপরিহার্য্য মানুষ। ন্যূনতম ডিগ্রীটুকু না থাকলে যাকে বেয়ারার চেয়ে বেশি মর্য্যাদা তোমরা দাও না।

শ্রীলা মুঠো করা হাত উপরে তুলে বলত—মিউটিনীয়ার সুনীত মিত্র। ললিতা চেচিয়ে বলত জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ।

নিজেকে অচল বলে জাহির করে গোটা সমাজটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চায় সুনীত। ভাবটা অনেকটা শেষের কবিতার অমিত রায়ের মত। কিন্তু নিজের জীবনে লাবণ্যের পদক্ষেপের সম্ভাবনায় সে রীতিমত ভীত। সুনীত চায় থ্রীল। গতির আনন্দ। সুনীত উদ্দাম গতিতে মোটর সাইকেল চালায়। মোটর চালনায় ওর অনুরাগ নেই। মোটর সাইকেল চালানোতে খানিকটা ঘোড়ায় চড়ার আমেজ পাওয়া যায়। বেশ একটা মধ্যযুগীয় উন্মাদনা। কিন্তু মোটর চড়ার মধ্যে কোন থ্রীল নেই।

এ হেন সুনীত যে নিজে চিরদিন দুঃখকে তুচ্ছ করে এসেছে এবং মায়ের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত যার চোখে একফোঁটা জল ছিল না, সেও শ্রীলার বিষণ্ণতায় বিমর্ষ হ'ল।

কি রে ছোট অমন মুখ গোমড়া করে ব'সে আছিস কেন?

শ্রীলা আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সহসা সুনীতের কথায় চমক ভাঙ্গল। কই না তো।

মিথ্যে কথা, সুনীত বলল তুই বুঝি শকুন্তলার মত রোমান্টিক হবার চেষ্টা করছিস?

তুমি আমাকে রোমান্টিক কোথায় দেখলে ছোড়দা?

কেন ? বিকেলের পড়ন্ত আলোয় গালে লাল আভা খেলিয়ে এলোচুল বাতাসে উড়িয়ে জানালার গারদ ধরে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস। এ তো রেগুলার ইনস্যানিটির লক্ষণ।

তাহলে কি হবে ?

এর নাম রোমান্টিক ইনস্যানিটি। ইনস্যুলিন ট্রিটমেণ্ট—শক থেরাপী কোন কিছুতেই সারবার কথা নয়। এক মাত্র ওষুধ—

শ্রীলার বেণীটা টেনে দিয়ে সুনীত বলল 'বিয়ে'। শ্রীলা লজ্জায় লাল হল। বিকালী আলোতে ছটা লাগল শ্রীলার লাল শাড়ীর বর্ণালীতে।

সুনীত হোহো করে হেসে উঠল। মেজবৌদি বারান্দা দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল। সুনীতের উচ্চকিত হাসির শব্দে ঘরে ঢুকল। হাসি নয়, যেন উপছে ওঠা ফোয়ারা।

হঠাৎ এত হাসির ঘটা কেন ?

সুনীত হাসি থামিয়ে বলল, অত্যন্ত ভয়ের ব্যাপার বৌদি।

ভুরু কুঁচকে মেজ বৌদি শুধোল, কেন ?

পশ্চিম আকাশে প্রচণ্ড ঝড়ের সূচনা।

কি যে হেঁয়ালী করে কথা বল কিছুই বুঝিনা।

তুমি দেখতে পাচ্ছ না শ্রীলার মুখ যেন আষাঢ়ের সজল কালো মেঘ।

তা তো দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি বরং তোমার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ছি।

কেন কেন ?

এতদিন তোমার কথায় তো এত বাহার ছিল না, আজ হঠাৎ—

ও এই, সুনীত আর একবার হাসল—এতদিন যা ছিল না আজ যে তা হবে না এর কোন সঙ্গত কারণ নেই। এতদিন তোমার চুলে পাক ধরেনি, আজ ধরেছে। অর্থাৎ তুমি বুড়ী হয়েছে, সুতরাং—

থামো। আমার বয়সের কথা না ভাবলেও চলবে। কিন্তু যা বলছিলে বলো।

শ্রীলার হংসদূত যে এখনও প্রিয়জনের বারতা নিয়ে ফিরে এল না বৌদি।

তাতে কি হয়েছে। সময় তো আর পেরিয়ে যায়নি। তাছাড়া দূর থেকে কি সব কিছু অনুমান করা সম্ভব? হয়ত কাজে ব্যস্ত রয়েছে, কিংবা দিল্লীতে নেই আদৌ।

তা অবশ্য সম্ভব, কিন্তু বৌদি--

কোন কিন্তু নেই। তুমি আজেবাজে কথা বলে ওর মন খারাপ করে দিও না। মেজবৌদি সস্নেহে শ্রীলাকে কাছে টানলেন।

"যে জন ডুবেছে সখী তার আর কি আছে বাকী গো।" আমি নতুন করে শ্রীলার মন খারাপ করে দেব? হায় কপাল। শ্রীলা আর একবার আরক্ত হল।

কথার কি ছিরি। মেজ বৌদি বলল।

সন্ধ্যে উতরে গেছে। ঘরের বাতাস রজনীগন্ধার সুবাসে মন্থর। বাইরে ধূসর জ্যোৎস্না। শ্রীলা বাইরে এসে দাঁড়াল।

মেজবৌদি সুনীতকে বললেন আচ্ছা সুনীত, চিঠি আসতে যদি দেরীই হয়, তাহলে?

তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত চিঠির জন্য অপেক্ষা করে তারপর খোঁজখবর নিতে হবে।

কোথায় খোঁজ নেবে?

কেন দিল্লীতে? নিখিলেশ বলে যে একটা মানুষ ছিল সেটা আর মিথ্যে নয়।

মেজ বৌদি এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর বললো, আচ্ছা সুনীত, ভুবন কাকাকে লিখে দিলে হয় না?

এতো ব্যস্ত হচ্ছ কেন, প্রয়োজন হলে সব ব্যবস্থাই করা যাবে। কিন্তু এবার আমাকে উঠতে হয় বৌদি।

এখনই যাবে ? পৌঁছুতে তো সই রাত্রি দশটা।

তাতে কি হয়েছে। জীবনটা উন্মাদের জন্য নয়। উন্মাদনার জন্য বৌদি। থ্রীল যদি না রইল তাহলে কি রইল।

এই থ্রীলের জন্যই একদিন ললিতাকে সুনীত দূরে ঠেলে দিয়েছিল। অথচ ললিতার কোন অপরাধ ছিল না। ললিতার এবং সুনীতের সেই পূর্বরাগের কাহিনী শ্রীলার অজানা নয়। অথচ কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেল। নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলল ললিতা আর জীবনটাকে রেসের ঘোড়ার মত ছুটিয়ে দিল সুনীত। সুনীত বেপরোয়া। সুনীত বলে, জীবনটা মানস সরোবরের মত শান্ত শীতল নিস্তরঙ্গ নয়। তরঙ্গমুখর ব্রহ্মপুত্রের মতই উত্তাল উদ্দাম। সুনীতের সতীর্থ কেউ নেই। যারা ছিল তারা ওর থ্রীলের পাল্লায় পড়ে হেরে গেছে, পিছিয়ে গেছে। ললিতাও তাদের মধ্যেই একজন। তাদের গতিমন্থর জীবনে মনোরম আশ্রয়ের আয়েস আছে, একটি সুখী স্ত্রী, একটি নিরুদ্বেগ জীবিকার আশ্বাস আছে, কিন্তু, সুনীত বলে,থ্রীল নেই। বৈচিত্র নেই, নেই নিত্য নতুন আনন্দের।

আর সুনীত ? ওর পিছনে কোন বন্ধন নেই। ভবিষ্যতের কোন স্বপ্ন নেই। আছে শুধু এগিয়ে চলার নেশা। গতির আনন্দে ও এগিয়ে চলে। তাই সুনীত ফী বছর মোটর সাইকেল র‍্যালীতে যোগ দেয়। দূরপাল্লার ভ্রমণে বেরোয়, কখনও উটি, কখনও নীলোখেরী, ফরিদাবাদ।

এই সুনীত ললিতার জীবনের প্রথম পুরুষ। শৈশবের কোন গোধূলি বেলায় ললিতার সঙ্গে সুনীতের পরিচয় হয়েছিল সে কথা আজ কারুরই মনে নেই। চোখে কাজল, কপালে খয়েরী টীপ আর রঙীন স্কার্ট পরা প্রজাপতির মত একটি ছটপটে মেয়ে এ বাড়ীতে আসত। খঞ্জনা পাখীর মত তির তির করে এঘর ওঘর করত। এক মুহূর্ত চুপ করে বসতে পারত না। কখনও অন্যমনে

ঢুকে পড়ত সুনীতের ঘরে। সুনীত পড়ার টেবিল থেকে চোখ তুলে তাকাত। একটু মৃদু হেসে আবার পড়ায় মন দিত। এবং প্রতিদিনই ললিতা অন্ততঃ একবার ছল করে সুনীতের ঘরে ঢুকে পড়ত। সেই বয়সে আন্তরিকতা হতে সামাজিক বাধা ছিল না। ছিল না লোকলজ্জার আশঙ্কা। তাই সুনীতের কাছে ছবি আঁকা শেখা ললিতার একটা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম হয়ে দাঁড়াল। তখন শ্রীলার কাছে নয়। সুনীতের কাছেই আসত ললিতা। কেমন যেন নেশা হয়ে গিয়েছিল। কৈশোরের সেই দিনগুলোতে চাপল্যই ছিল বেশী। উচ্ছল যৌবনের অনুরাগে রঞ্জিত ছিল না। ছিল না এমন আপন করে কাউকে কাছে পাওয়ার তিতীক্ষা। তবুও ললিতা সুনীতের আশেপাশে গুণগুণ করত। কখনও সুনীত ললিতার বেণী ধরে টেনে দিত। কখনও বা খেলাছলে ললিতা সুনীতের চোখ টিপে ধরত। সুনীত কোনদিন ভাবেনি যে ললিতা তার কিশোরী হৃদয়ের গভীরে একটি সুন্দর স্বপ্নকে সযত্নে লালন করছে।

নিজের চারপাশে একটা অহমিকার প্রাচীর গড়ে তুলেছিল সুনীত। এবং সেই বয়সেই। না, প্রেমে পড়ার মত দুর্বল মনোবৃত্তি সুনীতের নেই। কতকগুলো পুরোন কথাই ঢং বদলে ফিরে ফিরে বলা। আকাশের দিকে অকারণ উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। দু চোখে কান্নার সমুদ্রকে ধরে রাখা। প্রেম সম্বন্ধে মোটামুটি এই ছিল সুনীতের ধারণা। সুনীত ভেবেছিল ললিতা হয়ত এর ব্যতিক্রম। এবং ললিতাও সুনীতের কাছে অনন্যা হতে চেয়েছিল। তাই বহুবার মনের মধ্যে জমে ওঠা কথাগুলো বলতে গিয়েও থেমে গেছে। অতিকষ্টে রুদ্ধ করেছে তার প্রাণের আবেগকে। কারণ ললিতা জানত, সুনীত হয়ত চুরমার করে দেবে ওর আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নকে।

কিন্তু ললিতা পারেনি। হেরে গিয়েছিল ও। বর্ষণক্লান্ত একটি রাত্রির একটি উন্মুখ অসতর্ক মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়েছিল ললিতা। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারেনি।

বৃষ্টির জল গাছের পাতা চুঁয়ে চুঁয়ে মাটিতে পড়ছিল। তার দীর্ঘ প্রলম্বিত টুপ-টাপ শব্দ ভেসে আসছিল। বাতাসে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। পাম গাছের মাথা দুটো এলিয়ে পড়ছিল পরস্পরের গায়ে। কানাকানি করছিল যেন। বাগানের জমাট অন্ধকারকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হচ্ছিল। রাস্তায় বাস চলাচল এখন থেমে গেছে। ললিতা এসেছিল একটা জটিল ইকোয়েশন সমাধান করবার জন্য।

ললিতাকে দেখে বিস্মিত হল সুনীত।

ললিতা তুমি এত রাত্রে!

ললিতা। কেন আসতে নেই বুঝি?

সুনীত। তা নয়, এই বর্ষার রাত্রে, জল কাদা ভেঙ্গে—

ললিতা। তুমি ভুলে যাচ্ছ সুনীতদা, তোমাদের বাড়ী থেকে আমাদের বাড়ী মাত্র দু মিনিটের পথ এবং আসার জন্য কোন প্রস্তুতি লাগে না।

সুনীত। কিন্তু হঠাৎ?

ললিতা। কাল পরীক্ষা। কয়েকটা ইকোয়েশন বুঝে নিতে এলাম তোমার কাছে।

সুনীত একবার ভুরু কুঁচকে তাকাল ললিতার দিকে। বাইরে তখন আবার অঝোর ধারায় বৃষ্টি সুরু হয়েছে। টেবিলে ঝুঁকে দাঁড়াল ললিতা। সুনীত মাথা নীচু করে ইকোয়েশনটা কষতে লাগল। ললিতার চুল উতলা হাওয়ায় উড়ে উড়ে বার বার সুনীতের মুখে চোখে পড়তে লাগল। টেবিল থেকে মুখ না তুলেই সুনীত বলল চমৎকার।

ললিতা। কি?

সুনীত। তোমার চুলের মিষ্টি গন্ধ। ইচ্ছে হয় ওর মাঝে হারিয়ে যাই।

ললিতা। হারিয়ে যেতে মানা কোথায়। ললিতার কণ্ঠ

আবেগে কম্পমান। সারা শরীরে পুলকের শিহরণ। একটা দুরন্ত পিপাসাকে প্রাণপণে চেপে রাখে ললিতা।

সুনীত একমনে ইকোয়েশনটা করে যায়। বাইরে গভীর কালো রাতের ইশারা। ললিতার দ্রুত উষ্ণ নিশ্বাস পড়ে সুনীতের ঘাড়ের উপর। চোখের পাতা কাঁপে থর থর করে। সুনীতের পাশে আর একটু ঘন হয়ে দাঁড়ায় ললিতা। বাঁ হাত দিয়ে এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে নেয়। ওর চুড়ীগুলো মণিবন্ধ থেকে কনুই পর্যন্ত সরে আসে একটা টুংটাং মিঠে শব্দের তরঙ্গ তুলে।

বা! সুনীত আর একবার মুগ্ধ হয়।

কি? ললিতার হৃদয় দ্রুত লয়ে স্পন্দিত।

তোমার ওই চুড়ীর আওয়াজ। যেন নুপুরের ঝঙ্কার।

আজ তোমার সব কিছু ভাল লাগছে—কেন?

জানি না হয়ত এই অকাল বর্ষণের জন্য। কিম্বা তুমি এসেছো বলে।

খুশির সাহসে ললিতা বলল, আমি তো রোজই তোমার কাছে আসি।

কিন্তু রোজ তো এরকম বৃষ্টি পড়ে না। রোজ তো হিমেল বাতাস রজনীগন্ধার সুগন্ধ বয়ে আনে না। রোজ বিদ্যুতের ঝলকানিতে হৃদয়ে চমক লাগে না।

ললিতা সুনীতের কণ্ঠে প্রশ্রয়ের সুর খুঁজে পেল। বৃষ্টির রাতে নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ করে মনে হয়। ললিতা বলল, একটু আগে বাড়ীতে বসে ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম। তখন কেন জানি না, তোমার কথা মনে হল। মনে হল বৃষ্টি ধারায় অনুরঞ্জিত এই মুহূর্তগুলি হারিয়ে যাবে অনন্তের অন্ধকারে। কোনদিন তা ফিরে আসবে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। তাই প্রতিটি মুহূর্তই প্রাণ ভরে উপভোগ করতে হয়। প্রতিটি সুগন্ধ বুক ভরে আঘ্রাণ করতে হয় আর প্রতিটি সৌন্দর্য্যই নয়ন ভরে দেখতে হয়।

কিন্তু একটি হৃদয়, একজোড়া চোখ এবং একটি প্রাণ দিয়ে তো সব দেখা সম্পূর্ণ হয় না, তাই—

ললিতা যেন কবিতার কথা বলে। কতই বা বয়স এখন ললিতার ?

সুনীত বলল।

তাই কি ?

তাই অনেক দ্বিধা অনেক সঙ্কোচের প্রাচীর পার হয়ে তোমার কাছে এসে পৌঁছালাম।

সুনীত উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাল। একটু একটু বৃষ্টির ছাঁট আসছে জানালা দিয়ে। ললিতা সুনীতের পাশাপাশি দাঁড়াল।

বৃষ্টির এই একটানা সুর যেন বিলম্বিত বেহাগের আলাপ। কিন্তু এই অসময়ে তুমি কেন এলে ললিতা ?

ললিতা সুনীতের হাতে হাত রাখল। আলতো স্বরে বলল, তুমি বোঝ না ?

বুঝি। কিন্তু আমি যে গুটী পোকার মত নিজের চারপাশে একটা অচ্ছেদ্য বর্ম সৃষ্টি করে বাস করছি। সেখান থেকে তো বার হতে পারি না। কিন্তু বুঝি ললিতা, তুমি কেন সেই কঠিন আবরণ ভেদ করে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে, আমি যে হারিয়ে যাচ্ছি ললিতা।

সুনীতের হাতের মধ্য ললিতার হাত ভীরু কপোতীর মত কাঁপতে লাগল। ললিতার মনে হল, সে বুঝি হঠাৎ পাখীর পালকের মত হাল্কা হয়ে গেছে। হাওয়ায় ভেসে যেতে পারে শরতের মেঘের মত অথবা শিরীষফুলের পাপড়ীর মত লুটিয়ে পড়তে পারে মাটিতে। জানালার গরাদটা শক্ত করে ধরল ললিতা। ওর সমস্ত শরীরটা আবেগে কাঁপতে লাগল থর থর করে। ললিতা স্খলিত স্বরে বলল সুনীতদা, আমাকে ধরো। আমার মনে হচ্ছে আমি পড়ে যাব।

হয়ত সম্বিত হারিয়ে পড়েই যেত ললিতা। কিন্তু সুনীতওর

পতনোন্মুখ দেহটা দুহাত দিয়ে ধরে ফেলল। তারপর সহসা চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিল ললিতাকে। সুনীতের দুই বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হতে লাগল ললিতার সমস্ত শরীর। এবং সেই অন্ধদেবতার চাতুরীতে বর্ষণমুখর রাত্রির ক্রীড়াকে চুরমার করে বাজ পড়ল কোথাও আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাতিটা নিভে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে সুনীত বলল ইলেট্রিক ফেল করেছে।

সুনীতের বাহুবন্ধনের মাঝে ললিতার বেপথমান কুমারী হৃদয় দ্রুত তালে স্পন্দিত হতে লাগল। উত্তুরে বাতাসে জানালার পর্দাগুলো উড়তে লাগল। নারকেল পাতার নিঃস্বরনের সঙ্গে ওদের উষ্ণ নিঃশ্বাস একাকার হয়ে গেল আর অকস্মাৎ সুনীত অনুভব করল ও হেরে গেছে।

ললিতাকে ধীরে ধীরে সোফায় বসিয়ে দিয়ে আবার জানালার কাছে দাঁড়াল। সুনীত প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে চাইল। সুনীত রাত্রির দেবতার কাছে আকুল প্রার্থনা জানালো আমার এই দীনতা তুমি ক্ষমা করো।

সোফায় বসে ললিতাও বেদনায় আতুর। তারপর দীর্ঘক্ষণ দুজনেই নিশ্চুপ। ঘরের মধ্যে একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা। যেন কেউ নেই। শুধু দুটো অশরীরী ছায়ামূর্তি মৌনতার আধারে ডুবে আছে।

ললিতা মনে মনে প্রার্থনা করছিল যেন আলো আর না জ্বলে। এই লজ্জা, এই দীনতা রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাক অনন্তকাল।

সুনীত শুধু ভাবছিল যদি পৃথিবীতে চিররাত্রিই বিরাজ করে তাতেই বা ক্ষতি কি ?

কিন্তু পৃথিবীর আদিমতম মানুষ-মানুষী নিষিদ্ধ ফল খেয়ে অন্ধকার থেকে আলোতে এসেছিল অথবা আলো থেকে অন্ধকারে ? মেলেনি উত্তর।

অবশেষে একসময় আলো জ্বলল। ললিতা সোফার হাতলে দুই হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে বসেছিল। আর সুনীতও জানালা দিয়ে

বাহিরের দিকে তাকিয়েছিল যেখানে আলো নেই। অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘ পরিস্কার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সুনীত আর ললিতা কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছে না। এই অপরিসীম লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য জানালা থেকে মুখ না ফিরিয়ে সুনীত বলল ললিতা রাত হয়েছে, বাড়ী যাও।

ললিতার মনে হল ওর সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ক্লান্তির জড়িমা মাখানো কণ্ঠে ললিতা বলল, সুনীত আমায় একটু পৌঁছে দাও।

মুখ নত করে সুনীত বলল, ক্ষমা করো ললিতা। নিজের ওপর বিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলেছি।

'সুনীতদা' ললিতার গলা ডুকরে কেঁদে উঠার মত শোনাল আমিও যে ফুরিয়ে গেছি সুনীতদা।

সুনীত জবাব দিল না। বাইরের বাতাস থেমে গেছে অনেকক্ষণ। জানালার পর্দাটা আর নড়ছে না।

এবার মুখ ফেরাল সুনীত। ভাঙ্গা গলায় বলল তুমি কেন এ ভাবে আমাকে বিপন্ন করলে ললিতা। আমি যে নিজের কাছেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছি না।

বিশ্বাস করো সুনীতদা, এ আমি চাইনি। বাইরের অক্লান্ত বর্ষণ আর প্রমত্ত বাতাস যেন হঠাৎ আমার মনের মধ্যে আনন্দের সুর তুলল আর সেই মুহূর্তেই বাতিটা নিভে গেল। কিসের নেশায় আমি যেন তোমার মাঝে হারিয়ে গেলাম। নিঃশেষ হয়ে গেলাম।

কিন্তু ললিতা, তুমি কেন বুঝলে না আমি মানুষ, দেবতা নই।

ললিতা ম্লান হেসে বলল, সুনীতদা, দেবতাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তাঁরা মানুষের চেয়েও বেশি বিহিংসেবী। কিন্তু সেকথা থাক। তুমি আমায় এবার পৌঁছে দাও।

সুনীত ললিতাকে নিয়ে পথে বেরুল। মধ্য রাত্রির নির্জন

শহর। দু একটা কুকুর পথ পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। স্ট্রীট লাইটগুলো অবসন্ন।

পথ চলতে চলতে ললিতা বলল, কিছু বলবে না ?

সুনীত বলল কিছুই তো বলার নেই।

ললিতা কঠিন কণ্ঠে বলল সুনীতদা, এই নির্বিকার আত্ম অপচয়ের কোন মানেই হয় না। একটা ছদ্ম আবরণের মধ্যে নিজেকে রেখে নিজের কাছ থেকে নিজেই পালিয়ে বাঁচো। নিজের মধ্যে যে মানুষটা রয়েছে তাকে ঝুটো অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে দেবতা করে তুলছ। সোজা কথায় এর নাম—

সুনীত ব্যগ্র ভাবে ললিতার চোখে চোখ রাখল। ললিতা কথাটা শেষ করল, এর নাম ভণ্ডামি।

সুনীত মিইয়ে গেল। প্রতিবাদ করল না ললিতার কথার। শুধু বলল তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে ললিতা।

ললিতার মুখ আলোয় উদ্ভাসিত। আনন্দ আর ঔৎসুক্যে চিক চিক করতে লাগল চোখ দুটো।

সুনীত শুধু বলল তুমি আর আমার কাছে এসো না। সুনীত আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে বাড়ীর দিকে হাঁটতে সুরু করল।

ললিতা আর একবার সম্বিৎ হারালো। ডুকরে কেঁদে উঠল ললিতা। সুনীত, তুমি মানুষ নও। পাথর।

ললিতা সুনীতের কাছে একটা ইকোয়েশন বুঝতে এসেছিল। কিন্তু বোঝা সাঙ্গ হয়নি। সে ইকোয়েসনের আজও সমাধান হয়নি ললিতার জীবনে। সেই সরল জ্যামিতিক সমস্যাটা আজ ললিতার কুমারী জীবনের অনেক গৌরব আর লজ্জার সঙ্গে একাকার হয়ে আছে।

এ কাহিনী দার্জিলিংএর একটি নীল নির্জন দুপুরে শ্রীলাকে শুনিয়েছিল ললিতা। ললিতা সুনীতের নিষেধ পালন করেছিল

বর্ণে বর্ণে। যুগযুগান্তর ধরে উর্ব্বাশারাই বিশ্বামিত্রদের তপোভঙ্গ করেছে আর সারা জীবন ধরে বহন করেছে তাদের অভিশাপ।

সুনীতের আঘাত সইতে পারেনি ললিতা। প্রিয়জনের আঘাত দ্বিগুণ হয়ে বুকে বাজে। তাই ললিতা নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল। ভেঙ্গেচুরে তছ্‌নচ্‌ করে দিতে চেয়েছিল। ললিতা বলে 'আমার হৃদয় সুনীতের কাছে সমর্পিত। হয়ত তার নাগাল পাব না কোনদিন। কিন্তু ভীরু মন একটি পুরুষ হৃদয়ের আশ্রয় চায়। সেই আশ্রয়ের সন্ধানে আমি রিক্ত। সরোবর ভেবে এঁদো পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছি আকুণ্ঠ তৃষ্ণা বুকে নিয়ে। আমি ফুরিয়ে গেছি। হারিয়ে গেছি। নিঃস্ব হয়ে গেছি।' কিন্তু ধুলোয় পড়ে থাকা শঙ্খকে কি কেউ ধুয়ে মুছে পূজোর বেদীতে স্থান দেবে না? শ্রীলা ভাবে।

হৃদয় একটি চঞ্চল ভ্রমর। অস্থির চাপল্যে গুঞ্জন করে একটি মধুর চিন্তার চারপাশে। একটি মধুর বারতা। একটি সুসমাচার। সে সমাচার কোন দূর প্রবাসী প্রিয়জনের। আর সেই বারতার জন্য উদ্বেল হ'য়ে উঠতে শ্রীলার কোন বাধা নেই। বাধা নেই বাগানের ওই হঠাৎ ফোটা হাসি ছলছল মুখ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবার। প্রতীক্ষা আর উৎকণ্ঠা মেশানো একটা ভীরু ভীরু আনন্দে ওর হৃদয় যেন সর্ব্বদাই কাঁপছে ভ্রমরের থরো থরো কেঁপে ওঠা পাখনার মত।

আজ শ্রীলার প্রতীক্ষার ত্রিশতম দিন। আজ থেকে ঠিক তিরিশ দিন আগে শ্রীলা নিখিলেশকে জানিয়েছিল তার অভিলাষ। তার বাড়ীর লোকেদের উন্মুখ আকাঙ্খা। জানিয়েছিল নিখিলেশ একবার আসুক। এ বাড়ীর লোক চোখ দিয়ে যাচাই করে নিক নিখিলেশের যোগ্যতাকে।

কিন্তু আজও নিখিলেশের কোন সংবাদ আসে নি। বাড়ীর

সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু শ্রীলা জানে নিখিলেশের চিঠি এবারে আসবে। শ্রীলার প্রতীক্ষা বাগানে গোলাপ হ'য়ে ফুটেছে। আর তার চারপাশে গুঞ্জন করছে ওর আকাঙ্খার ভ্রমর।

সেদিনই ললিতা ফিরে এল। ললিতা নীচে মেজবৌদির সঙ্গে গল্প করছিল। ওর গলা শুনে নীচে নামল শ্রীলা।

তুমি যে হিমালয়ের তুষার সারা অঙ্গে মাখিয়ে এসেছো ভাই। উচ্ছ্বসিত হয়ে মেজবৌদি বলল।

ভয় নেই বৌদি হাসিমুখে ললিতা জবাব দিল ও কলকাতার গরমে গলে যাবে। কিন্তু এরা সব কোথায়? শম্পা, বুলবুল বাচ্চু?

মেজবৌদির কোলের মেয়ে ঋতা বারান্দায় হামা দিয়ে একটা ধুলোয় পড়ে থাকা গোলাপ পাপড়ী তুলবার চেষ্টা করছিল। ললিতা ছোঁ মেরে ওকে কোলে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলল। ললিতার কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য পরিত্রাহী চীৎকার সুরু করল বাচ্চাটা।

কিন্তু তোমার ফিরতে দেরী হল যে? মেজবৌদি জিগ্যেস করল।

হিমালয়ের মাঝে আমি হারিয়ে ছিলুম বৌদি।

ভাগ্যিস আবার খুঁজে পেলে, মেজবৌদি সকৌতুকে বলল, না হ'লে আবার রেস্কিউ পার্টি পাঠাতে হ'ত।

আমার জন্য রেস্কিউ পার্টি? আমি তো অতলে তলিয়ে গেছি বৌদি। আমাকে রেস্কিউ করতে গেলে যে জীবনটাই রিস্ক করতে হবে, তা কি কেউ রাজী হবে?

জীবন নিয়ে যারা জুয়া খেলে এরকম লোকের সংখ্যা তো কম নয় পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ষ্টেকটা সেখানে লোভনীয়। মেজবৌদি কৌতুকভরে কথাগুলো ললিতার দিকে ছুড়ে দিল। ললিতার চোখ দুটো প্রথমে ছলছলিয়ে উঠল, তারপর আবার চোখে হাসি ফিরিয়ে

এনে বলল সেরকম লোকের হয়ত অভাব নেই পৃথিবীতে। মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডে নাইটরা সুন্দরী রাজকন্যাদের এক টুকরো হাসির বিনিময়ে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হত না। কিন্তু আমার কি আছে বৌদি? আমি যে দেউলে হয়ে গেছি।

শ্রীলা সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। ওর দিকে তাকিয়ে ললিতা বলল বাবাঃ, শ্রীলা তুই যে আশ্চর্য্য রোগা হয়ে গেছিস?

মেজবৌদি টিপ্পনি কাটলেন, হবে না কেন, ও যে এখন তপঃক্লিষ্টা পার্ব্বতী।

বৌদির রসিকতাটা হৃদয়ঙ্গম করে ললিতা বলল কিন্তু বৌদি মহাদেবের ধ্যান তো ভঙ্গ হয়েছে বহুদিন। এখন তো ও তপঃক্লিষ্টা নয় এখন ও তপঃসিদ্ধা।

হ্যাঁ ভাই, মহাদেবের ধ্যান ভেঙ্গেছে ঠিকই, কিন্তু মাত্র দুটি চোখ সবে খুলেছে। তৃতীয় নয়ন এখনও বাকী।

সর্বনাশ, তৃতীয় নয়ন যে মদন ভস্মের জন্য।

তা ঠিক। সে চোখে রাগের বিদ্যুৎ, সেই চোখেই অনুরাগের বর্ষণ। যে চোখ দিয়ে মদনকে ভস্ম করেছিলেন সেই চোখ দিয়েই পার্ব্বতীর প্রেমকে বরণ করেছিলেন। তাই তৃতীয় নয়ন না উন্মীলীত হলে পার্বতীর তপস্যা সাঙ্গ হবে না। মেজবৌদি তির্য্যক দৃষ্টিতে শ্রীলার দিকে তাকাল। শ্রীলার দৃষ্টি সুদূরে নিবদ্ধ। শ্রীলার মনে হ'ল বুঝি একটু আশ্রয় আর আশ্বাস পেলে ও ভেঙ্গে পড়বে।

তোমরা গল্প কর আমি বরং হাতের কাজগুলো সেরে নিই। মেজবৌদি বেরিয়ে গেল।

শ্রীলার ঘাড়ে একটা আস্তো টোকা মেরে ললিতা শুধোল, কিরে কি ভাবছিস।

শ্রীলা অন্যমনস্ক ভাবে বলল "কিছুনাতো"। ললিতা মুখটিপে হাসল। বলল তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে শ্রীলা। অনেক, অনেক।

ললিতার গলা জড়িয়ে শ্রীলা বলল, তাহ'লে ওপরে চল।

শ্রীলার ওপরের ঘর থেকে অনেকটা আকাশ দেখা যায়। লতানে গোলাপটা ওর জানালা বেয়ে ওপরে উঠেছে। শ্রীলার বিছানায় ললিতা শরীরটাকে এলিয়ে দিল। একমাস দার্জিলিংএ থেকে বাস্তবিক অনেক সুন্দর হ'য়েছে ললিতা। ওর চোখের কালিমা ঢেকে গেছে। হাল্কা একটা মেদের আস্তরণে কণ্ঠার হাড়ও ঢাকা পড়েছে। চোখের চাউনিতে ফিরে এসেছে দীপ্তি। শ্রীলার মনে হ'ল মেজ-বৌদি ঠিকই বলেছেন, ললিতা কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার অঙ্গে মাখিয়ে নিয়ে এসেছে।

কি রে, কিছু বল। ললিতা বলল।

কি বলব। সব যে ভুলে যাচ্ছি। কথাগুলো মুখের গোড়ায় এসেও হারিয়ে যাচ্ছে।

নিশ্চয়ই নিখিলেশের কোন কথা?

নিখিলেশের সব খবরই তোর জানা। কারণ দার্জিলিং থেকে ফেরার পর ওর আর কোন সংবাদ নেই।

সেকি, ললিতাকে বিচলিত মনে হ'ল তুই কোন চিঠি দিসনি?

দিয়েছি। কিন্তু এখনও জবাব আসেনি।

কতদিন আগে?

একমাস।

আর কোন স্মারক পত্র, অর্থাৎ রিমাইণ্ডার?

তার কোন প্রয়োজন আছে কি? শ্রীলা অভিমানের সঙ্গে বলল, আমার কাছ থেকে একটি পত্রই কি যথেষ্ট নয়? জবাব পাবার জন্য দ্বিতীয় পত্র দিতে হবে এ দীনতা আমি রাখব কোথায়?

ললিতা বুঝল শ্রীলা আহত হয়েছে। এবং তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু নিখিলেশ চিঠি পেয়েও জবাব দিচ্ছে না এও তো ভাবতে পারছে না ললিতা।

শ্রীলাকে আশ্বস্ত করবার জন্য ললিতা বলল তোর প্রথম চিঠিটা

হারিয়েও তো যেতে পারে? সে চিঠি হয়ত প্রাপকের ঠিকানায় পৌঁছাল না কোন দিন, সেটা তো ও পক্ষেরও ভুল বোঝার কারণ হতে পারে অতএব প্রথম পত্রের রোমান্টিক মূল্য যাই থাক না কেন বাস্তব মূল্য খুব বেশি নেই।

শ্রীলা মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাল, যেন তাই হয়। যেন ওর সুদূর প্রসারী দুশ্চিন্তাগুলো মিথ্যে হয়। ওর প্রথম পত্র যদি নিখিলেশের কাছে নাই পৌঁছে থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু চিঠি পেয়েও নিখিলেশ জবাব দেয়নি এ লজ্জা সে রাখবে কোথায়?

নিখিলেশের সম্বন্ধে বাড়ীর কি মত? সোজাসুজি জিগ্যেস করল ললিতা।

আমার এবং তাঁদের মত অভিন্ন। কিন্তু তাঁরা একবার চোখে দেখে যাচাই করে দেখে নিতে চান। শ্রীলার গালে লজ্জার লালিমা খেলা করতে লাগল, তাই ওকে একবার আসতে লিখেছি এখানে।

ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল তারই প্রত্যুত্তরের আশায় তুমি নিজেকে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর করে ফেলেছো। কিন্তু জীবনের এই তো শুরু—

কেন?

একজন পুরুষ বা একজন নারী একক ভাবে কেউই সম্পূর্ণ নয়। দুই এ মিলে এক। সেই এক ও অখণ্ড জীবন তুমি সুরু করতে চলেছ।

ললিতার কথাগুলো অনুরণিত হ'ল শ্রীলার মনের মধ্যে। দুই এ মিলে এক। শ্রীলা নতুন করে ভাবল। নতুন করে স্বপ্ন দেখল নতুন জীবন যাপন করবার।

নিজেকে অপচয় করে ললিতা জেনেছে জীবনই বেঁচে থাকবার জন্য। অপচয় করবার জন্য নয়।

এই একমাস কোথায় কাটালি? ললিতাকে জিজ্ঞেস করল শ্রীলা।

'দার্জিলিং-এর আনাচে কানাচে।'

'অর্থাৎ ?,

কিছুদিন কালিম্পং-এ, কিছুদিন কার্শিয়াং-এ আর কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে।

অজ্ঞাত বাসে ? শ্রীলা চমকিত হল "কোথায় ?"

দার্জিলিং থেকে অনেক দূরে, ভুটান সীমান্তে মিরিক নামক স্থানে। সভ্যতার আলোক যেখানে এখনো পৌঁছায়নি, সেখানে পপলারের ছায়া ঘেরা একটি মনোরম বাংলোতে, যার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদী, আশে পাশে অজস্র বুনো ফুল, তুষারের ছায়া জড়ানো ঘাসে ঘাসে শিশির আর মুঠো মুঠো রোদ্দুর, সেখনে আমি হারিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু সেখানে কেন ?

উত্তরাধ্যয়ন বা আত্মঅন্বেষণের জন্য বলতে পারো।

শ্রীলা। একা ?

ললিতা। না প্রীতম ছিল সাথে।

শ্রীলা। ভয় করে নি ?

ললিতা। না পুরুষদের আমি ভয় করি না।

শ্রীলা। 'তাহলে কি করো ?'

ললিতা। করুণা করি। ওরা কাঙ্গাল আমার চেয়েও।

শ্রীলা। প্রীতম ও কি তাই ?

ললিতা। সেই আমার অন্বেষণ। নিজেকে কাঙ্গাল কার তুলে ধরেছিলাম। ও আমাকে ভেঙ্গে চুরে তছনচ করে দিতে পারত কিন্তু তা করেনি। আমার দীনতাকে ও করুণা করেছে। সেইখানে আমার পরাজয়। আমার নিঃস্বত্তাকে অনুভব করেছে অসীম মমত্ব দিয়ে। সেখানে আমার জয়। আমি প্রীতমকে শ্রদ্ধা করি। ভালবাসি এ কথা বললাম না। এ কথা আরও অনেককে অনেকবার বলেছি।

শ্রীলা বুঝলো ললিতা বর্তমানে প্রীতমের প্রতি অনুরক্ত। ওর এই অনুরক্তির মধ্যে ছলনা নেই কোথাও। প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারাও একটা দুর্লভ গুণ। সহসা একটা প্রশ্ন জাগল শ্রীলার মনের মধ্যে, ললিতা কি তাহলে প্রীতমকেই বিয়ে করবে।

তুই কি প্রীতমকেই বিয়ে করবি স্থির করেছিস্? ললিতা শ্রীলার চোখে চোখ রাখল তারপর বেদনার্ত কণ্ঠে বলল, শ্রীলা আমি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। একটা অবলম্বন না পেলে আমি বাঁচতে পারব কিনা জানি না। নিজেকে একজন যথার্থ সহৃদয় মানুষের কাছে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলাম। জেনে নিতে চেয়েছিলাম আমি কি সত্যিই মেকী? আমার সে আকাঙ্খা পূরণ হয়েছে। আজ আমার মরতেও দুঃখ নেই, কিন্তু এতটা পথ পার হয়ে এসে পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অনুভব করছি আমি আজ ঠকতে চাই না, কাউকে ঠকাতেও চাই না। কিন্তু প্রীতম হয়ত—কথাটা শেষ করল না শ্রীলা। ললিতা বলল, হয়ত আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু ভালবাসলেই পেতে হবে এমন কোন কথা আছে?

জানি না শ্রীলা বলল, কিন্তু পাওয়ার জন্যই তো ভালবাসা।

ললিতা হেসে বলল আমার বিশ্বাস পাওয়ার জন্য ভালবাসা নয়। ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। এবং পাওয়াতেই ভালবাসার শেষ সার্থকতা নয়। ভালবাসার সার্থকতা ভালবেসে হারিয়ে যাওয়াতে।

শ্রীলা মনে মনে বলল ললিতা তুমি আবার মরেছ। মুখে বলল তুই কি প্রীতমকে ভালবাসিস?

হাসল ললিতা। ম্লান হাসি। ভালবাসা জীবনে একবারই আসে। প্রথম ভালবাসার লাভ ও ক্ষতির হিসেব মানুষ চিরকাল মনে রাখে। ব্যবসায়ীরা যেমন মনে রাখে জীবনের প্রথম লাভ লোকসানের কথা। আজ আর ভালবাসা নয়। ভাল লাগা। এই ভাল লাগাটাকেই বার বার সার্থক করে তুলতে চেয়েছি। কিন্তু

পারিনি। হেরে গেছি। প্রথম ভালবাসার অপ্রত্যয় আমার সব ভাল লাগাগুলোকেও ফিকে করে দিয়েছে।

ললিতার কণ্ঠ আবেগ রুদ্ধ। শ্রীলা বুঝল সুনীতের নিষ্ঠুর প্রত্যাখানই ললিতাকে দুর্বার করেছে, উদ্দাম করেছে। বার বার জিততে গিয়ে ললিতা শুধু হেরেই এসেছে। শ্রীলা আর কোন প্রশ্ন করল না ললিতাকে। ললিতা আবার বলল তোকে একটা আশ্বাস দিতে পারি শ্রীলা, প্রীতম ইজ গ্রেট, প্রীতম ইজ গ্রেশাস। কিন্তু অনেক রাত হয়েছে। আজ চলি, আর একটু বস না। ললিতার সঙ্গ ছাড়তে চায় না শ্রীলা।

শ্রীলার গলাটা একটু টিপে দিয়ে ললিতা বলল সব কথা যে একদিনেই ফুরিয়ে যাবে। বাকী কথাগুলো আগামী দিনের জন্য জমা রাখ। আর তোর কথাই তো শোনাই হল না শুধু শুধু অমনি বকে মরলাম।

শ্রীলা ললিতাকে এগিয়ে দিতে এল। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আলো হাতে খোঁপাটা ঠিক করতে করতে ললিতা ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল সুনীত কোথায় রে?

শ্রীলা বলল, বর্দ্ধমানে

ললিতা বলল, ওকে বলিস আমার কথা, প্রীতমের কথা। ও নিশ্চয়ই খুশি হবে।

বিধাতার ছলনার জাল কোথায় পাতা আছে কেউ জানে না নাহলে এক শৈলনগরীর শীতল ছায়ায় দুটি সমতলের হৃদয় একসুরে বেজে উঠবে কেন, কেন পরিচয় বন্ধুত্বের সীমা ছাড়িয়ে অন্তরঙ্গতায় রূপান্তরিত হবে এবং কেনই বা শ্রীলার দু দুটো চিঠি অনুত্তরিত থাকবে।

ললিতার কথা মত নিখিলেশের দিল্লীর ঠিকানায় আর একখানি চিঠি লিখেছিল শ্রীলা। ভেবেছিল যদি প্রথম চিঠিটা সত্যি না

পৌঁছে থাকে নিখিলেশের কাছে? যদি পথেই হারিয়ে ফেলে গন্তব্যের নিশানা?

কিন্তু দুটি চিঠি অবশেষে একই দিনে ফিরে এল পোষ্ট অফিস কর্তৃপক্ষের নির্দয় মন্তব্য নিয়ে। নির্দিষ্ট ঠিকানায় প্রাপককে না পাওয়ার জন্য চিঠি বিলি করা সম্ভব হল না। শ্রীলা শয্যা নিল দুঃখে, অপমানে, লজ্জায়। প্রত্যেকের চোখেই জিজ্ঞাসা, সুতরাং এরপর?

অধ্যাপক ব্রজবিলাস ইতিহাসের একটা দুরূহ সাল তামামি নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত ছিলেন। সুধন্যর কাছে সব শুনে বললেন, কি ব্যবস্থা করতে চাও?

অনুসন্ধান করে দেখতে চাই, লোকটা তো আর হারিয়ে যেতে পারে না। সুধন্যর জবাব।

দেখ, অত্যন্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে ব্রজবিলাস বললেন কিন্তু ভারত বর্ষের এই কোটি কোটি মানুষের জনারণ্যে একটি ঠিকানাবিহীন ব্যক্তিকে খুঁজে বার করা কি খুবই সহজ?

ব্রজবিলাসের কথায় চিন্তিত হল সুধন্য। এতটা সে ভাবেনি। সে ভেবেছিল দিল্লীর সবজান্তা ভুবন কাকার কাছে খোঁজ খবর নেবে। দিল্লীতে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই তার হদিশ দিতে পারবেন। অথবা কলকাতায় এ্যম্বাসি অফিস গুলোতে খোঁজ নেবে। কিন্তু এতটা ভেবে দেখেনি। ব্রজবিলাসের কথায় খানিক ঘাবড়ে গেল সুধন্য।

তাহলে আপনি কি করতে বলেন? মাথা চুলকে সুধন্য জিজ্ঞেস করল

ব্রজবিলাস বললেন অপেক্ষা করো, শ্রীলার সঙ্গে যদি তার সত্যিই অন্তরঙ্গতা হ'য়ে থাকে তাহ'লে খুজে বার করতে হবে না। একদিন সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। আর যদি তাকে নিতান্তই খুঁজে বার করার প্রয়োজন হয় তাহ'লে আমার মনে হয় শ্রীলার সঙ্গে তার বিয়ে না হওয়াই মঙ্গল। কারণ যে স্বেচ্ছায় লুকিয়ে থাকে বা ভুল

ঠিকানা দেয়, সে আর যাই হোক, সৎ নয়। অধ্যাপক আবার ইতিহাসের পাতায় মন দিলেন।

কিন্তু শ্রীলা ভারী মুসড়ে প'ড়েছে, সুধন্য বলল।

ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, অধ্যাপক বললেন।

সুধন্য কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ঠিক এই ব্যাপারটার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। চিঠির জবাব যতদিন আসেনি ততদিন একটা আশা ছিল। কিন্তু এখন আর ক্ষীণতম আশাও নেই। পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে গেছে সেই মানুষটি, নিখিলেশ যার নাম। ঠিকানাহীন গন্তব্য থেকে চিঠিগুলো ফেরৎ এসেছে। মেজবৌদি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

চিন্তিত মুখে বেরিয়ে এল সুধন্য। কোথাও এতটুকু আশার আলো দেখতে পায় না সুধন্য। সুধন্য ব্রজবিলাসের কথাগুলো ভাবে। সত্যিই কি নিখিলেশ একদিন নিজে থেকেই ফিরে আসবে? কিন্তু কবে? তার আগে কি কিছু করবার প্রয়োজন নেই সুধন্যর, শ্রীলার দায়িত্বশীল অভিভাবক হিসেবে?

বাবা কি বল্লেন? ধীর কণ্ঠে জিগ্যেস করল মেজবৌদি। একই কথা আর একদিন জিগ্যেস করেছিল মেজবৌদি। সেদিন সুধন্য শ্রীলার সঙ্গে নিখিলেশের বিয়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে গিয়েছিল। সেদিন চোখে ছিল অফুরন্ত আশা আর আগ্রহের ঝিলিক। আজ যেন সব আলো নিভে গেছে।

ক্লান্তভবে চেয়ারে দেহটাকে এলিয়ে দিল সুধন্য। বলল, বাবা বললেন নিখিলেশের সঙ্গে শ্রীলার যদি সত্যিই অন্তরঙ্গতা হয়ে থাকে তাহলে একদিন সে নিজে থেকেই ফিরে আসবে।

তার জন্য মেয়েটা কি অনন্তকাল প্রতীক্ষা করে বসে থাকবে নাকি? মেজবৌদির কণ্ঠে উষ্মা।

তাই তো কি করা যায়। কোন উপায় খুঁজে পায় না সুধন্য।

। তুমি বরং ভুবনকাকাকে একবার আসতে লিখে দাও। পরামর্শ দেন মেজ বৌদি।

সেই ভালো। সুধন্যের মনে হয়। অন্ততঃ মনের কাছে সান্ত্বনা রইল সুধন্য চুপ করে বসে নেই। নিখিলেশের হদিশ করবার চেষ্টা করছে সুধন্য।

ভুবনকাকা দিল্লীর অভিধান। দেওয়ানী-ই-আম এ কটা থাম আছে এবং সেক্রেটারিয়েটের এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেণ্টের হেড্ পিওনের নাম কি, দুই ভুবনকাকার জানা। সুতরাং সবার আগে ভুবনকাকার নামটাই মনে এল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সুধন্য এই ভেবে, যে এই বিপদে ভুবনকাকাই একমাত্র মুস্কিল আসান।

এ্যম্বাসিতে যখন চাকরী করে তখন নিশ্চয়ই ভুবনকাকার চেনা। প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও নামটা নিশ্চয়ই জানেন।

আশা ভঙ্গের বেদনায় কাতর শ্রীলা কিন্তু ভাবতেই পারে না যে নিখিলেশ সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া যাবে আর। ওই ফেরৎ আসা চিঠি দুটো যেন দুটো দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা। শ্রীলা শিউরে ওঠে।

সব শুনে সুনীতের মত ছেলে যে দুনিয়ার তাবৎ ভয়-ভীতির ভ্রূকুটিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়, সেও গুম হয়ে গেল। সুনীতও ভাবতে পারত যে ভুবনকাকা এলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। ভেবে সেও স্বস্তি পেতে পারত। কিন্তু ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তা মোটেই আশার ইঙ্গিত দেয় না। শ্রীলার ঠিকানা লেখা ভুল হতে পারে। নিখিলেশ তার বর্তমান ঠিকানায় নাও থাকতে পারে। এগুলো চিঠি ফেরৎ আসার কারণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে, কিন্তু নিখিলেশ নিজে থেকেও তো চিঠি দিতে পারত? তা না দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না সুনীত। এবং পায় না বলেই মনকে চোখঠেরে দুশ্চিন্তাগুলিকে চেপে রাখতে পারে না।

শ্রীলাও এই কথাগুলোই ভাবছিল। ওর অবুঝ মন নিখিলেশের

এই অভাবিত নীরবতার কারণ যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চাইছিল। শ্রীলা ভাবছিল, হয়ত ঠিকানা ভুল হওয়ার জন্য চিঠি নিখিলেশের কাছে পৌঁছায় নি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল তাহলে নিখিলেসই বা চিঠি দিল না কেন শ্রীলাকে? শ্রীলার ঠিকানা তো নিখিলেশের অজানা নয়? তারপর ভাবল, হয়ত নিখিলেশ ঠিকানা বদলেছে। এখানে দুটো প্রশ্ন জাগল শ্রীলার মনের মধ্যে। প্রথম প্রশ্ন, তাহলে সে কথা শ্রীলাকে জানানো উচিত ছিল। দ্বিতীয় প্রশ্ন, শ্রীলা যেমন নিখিলেশের কুশল চিন্তায় ব্যাকুল তেমনি নিখিলেশও কি শ্রীলার জন্য উৎকণ্ঠিত নয়? অবশেষে মনের মত করে একটা কথা ভাবল শ্রীলা, এবং ভেবে খানিকটা আশ্বস্ত হল। হয়ত শ্রীলা ঠিকানা লিখতে ভুল করেছে, এবং যেহেতু শ্রীলাই প্রথমে চিঠি দেবে বলেছিল নিখিলেশকে সেই জন্য নিখিলেশ শ্রীলার পত্রের প্রতীক্ষায় আজও দিন গুণছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীলার আশার শেষ প্রদীপটিও নিভে গেল হতাশার ফুৎকারে।

রাণী মাসীমা সব শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন পুরুষ জাতটাই ঠগের জাত। ওদের বিশ্বাস করতে নেই।

কিন্তু শ্রীলার মন বিশ্বাস করতে চাইছিল না যে নিখিলেশ ঠগ। তাহলে যে দার্জিলিংএ পপলারের শাখায় শাখায় ছড়িয়ে থাকা শপথগুলো মিথ্যে হয়ে যাবে, বার্চহিল আর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অনেক স্বপ্ন বর্ণহীন হয়ে যাবে আজ।

রাণী মাসীমার পুরুষ বিদ্বেষটা কারণহীন নয়। রাণী মাসীমা ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন মহীতোষকে। কিন্তু মহীতোষের সঙ্গে একটা অদৃশ্য বিরোধের অসুখে ভুগছেন রাণী মাসীমা। শ্রীলা জানে সে ইতিহাস। একদিন সেই বিরোধের কথা ব্রজবিলাসকে বলেছিলেন রাণী মাসীমা। কথাগুলো হঠাৎ কানে এসেছিল

শ্রীলার। সেই কথার জের টেনেই রাণী মাসীমা বললেন পুরুষরা ঠগের জাত ওদের বিশ্বাস নেই।

রাণী মাসীমার কথা শুনে শ্রীলারও বিশ্বাস দ্বিধাগ্রস্ত হল। এরপর একমাত্র ভরসা ভুবনকাকা। কিন্তু তাঁর কথাতেও অকূল হতাশার আভাস পেয়ে সবাই মুষড়ে পড়ল এবং আর একটা মারাত্মক আশঙ্কার কথা মনে পড়িয়ে দিলেন ভুবনকাকা।

ভুবন কাকা বললেন একজন নিখিলেশকে জানি, সে সেক্রে-টারিয়টে চাকরী করে।

সুধন্য আশান্বিত হয়ে জিগ্যেস করল তার ঠিকানা?

সুধন্যর সব উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে ভুবনকাকা বললেন না না, আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই। তার বয়স পঞ্চাশের ওপরে এবং সে ঘোরতর সংসারী। বড় মেয়েটার সম্বন্ধর ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এই তো সেদিন আমাকে বলছিল—

অতএব সন্দেহই থাকতে পারে না যে এ নিখিলেশ নিশ্চয়ই সে নিখিলেশ নয়।

আরও একজনকে জানি, সে অবশ্য নিখিলেশ নয়, তার নাম নিখিলবন্ধু, সে আমাদের কালীবাড়ীর ঝাড়ুদার।

সুতরাং এও নয়। দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল। ভুবনকাকার মত লোক, সারা দিল্লী যাঁর নখদর্পণে, তিনি যখন কোন হদিশ করতে পারছেন না—তখন দূর কলকাতা থেকে নিখিলেশকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করা সাগর ছেঁচে মুক্তো কুড়োনো ও দুই-ই সমান। দুশ্চিন্তার মাত্রা আর একটু বাড়িয়ে দিলেন ভুবন কাকা। একটা অনভিপ্রেত সম্ভাবনার কথা মনে পাড়িয়ে দিলেন অকস্মাৎ?

নিখিলেশের সঙ্গে শ্রীলার অন্তরঙ্গতা কতখানি নিবিড় হয়েছিল? যৌবনের অপরিণামদর্শিতায় দুটি চঞ্চলচিত্ত তরুণ-তরুণীর পক্ষে যা করা সম্ভব অর্থাৎ আজকাল আকছার যা হচ্ছে, অবশ্য ভুবন কাকা বিশ্বাস করেন শ্রীলা অতখানি বোকা হবে না, তবুও জেনে

নেওয়া ভালো। কারণ তাহলে সময় থাকতে ব্যবস্থা করতে হবে তো।

কথাটা শুনে চমকে উঠল সবাই। বৌদি, সুধন্য এবং ব্রজবিলাসও।

ঠিক। ব্রজবিলাস মাথা নাড়লেন। তুমি বরং বৌমাকে বলো শ্রীলাকে জিগ্যেস করতে, সুধন্যকে বললেন ব্রজবিলাস, ভুবন যা বলছে তা যদি ঠিক হয় তাহলে, তাহলে—

ব্রজবিলাসের কথাটা সম্পূর্ণ করলেন ভুবন কাকা, তাহলে এখুনি একটা ব্যবস্থা করতে হয়। পরিবারের একটা মর্য্যাদা আছে তো।

মুখ কালো করে উঠে গেল সুধন্য। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল মেজবৌদি।

সব শুনলে তো সুধন্য বলল ওকে জিগ্যেস করে দেখ।

মেজবৌদি ঘাড় নাড়ল। আমি পারব না। ছিঃ অবুঝ হোয়ো না, সুধন্য বোঝাতে চেষ্টা করে, বাবা, ভুবন কাকা যখন বলছেন।

না না আমায় বল না, ও কথা আমি জিগ্যেস করতে পারব না। মেজবৌদি সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরে শুয়ে সব শুনছিল শ্রীলা। বাইরে এসে বেশ স্পষ্ট গলায় বলল বৌদি তুমি ভুবনকাকাকে বলে দাও ওঁদের চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। নিখিলেশ আর যাই হোক, সে ভদ্রলোক।

মেজবৌদির বুক থেকে একটা পাষাণ ভার নেমে গেলে। সুধন্য স্বস্তীর নিশ্বাস ফেলল। নিখিলেশের হদিশ না পাওয়ার জন্য যতখানি দুশ্চিন্তা হয়েছিল তার চেয়েও বেশী শঙ্কিত হয়েছিল ভুবন-কাকার কথায়। শ্রীলার কথায় যেন উদ্বিগ্নতা অনেকখানি কমে গেল। শুধু মেজবৌদি মনে মনে ভাবলেন নিখিলেশ যদি নাই আসে আর, তাহলে?

আশার শেষ নেই। সান্ত্বনারও শেষ নেই। শ্রীলা ভেবে পায় না নিখিলেশের এই আশ্চর্য্য নীরবতার কারণ কি? দার্জিলিং স্টেশনেও নিখিলেশ শ্রীলাকে আশ্বাস দিয়েছিল দিল্লী পৌঁছে শ্রীলার চিঠি পেলেই সে চিঠি দেবে। এবং তারপরে শ্রীলা যেন তৈরী থাকে, নিখিলেশ বলেছিল, একটি অবুঝ বেহিসাবী মানুষকে নিয়ে সংসার পাতাবার জন্য। সেই আগামী দিনের সোনালী স্বপ্ন আর খুশির রঙ্গে রঙ্গীন মুহূর্তগুলি কি এত শিগ্‌গির ফিকে হয়ে যাবে? এত কথা, এত হাসি, এত গান সব মিথ্যে হয়ে যাবে? বিশ্বাস করতে মন চায় না। শ্রীলা তো নিজেকে নিঃশেষে নিখিলেশের হাতে সঁপে দিয়েছিল। ইচ্ছে করলে নিখিলেশ তো শ্রীলাকে তছনচ করে দিতে পারত। আর শ্রীলাই কি চায়নি নিখিলেশের বলিষ্ঠ বাহুর পেষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে? কিন্তু নিখিলেশের ভালবাসায় কোন কাঙ্গালপনা ছিল না। নিখিলেশ আপন শিষ্টতা আর রুচিতে ভাস্বর। তাই শ্রীলার মন বিশ্বাস করতে চায় না নিখিলেশ ওর সঙ্গে ছলনা করেছে। যে না চাইতেই সব কিছু পেতে পারত তার এ রকম ভীরুর মত পালিয়ে যাবার হেতু কি? এই সব নানান দুশ্চিন্তার সূত্রগুলো শ্রীলাকে অস্থির করে তুলল। শ্রীলার কলকাতার দিনগুলো বেদনায় ভরে উঠল।

আর লোকেই বা কি ভাবছে, শ্রীলার সমস্ত শরীরটা ঘৃণায় রি রি করতে লাগল। ভুবনকাকা তো একঘর লোকের সামনে একটা কলঙ্কের দুশ্চিন্তা হিমালয়ের মত তুলে ধরলেন। এবং অন্যান্যরাও যারা জানে এই শ্রীলা নিখিলেশের উপাখ্যান তারাও নিশ্চয়ই এই কথাই ভাবছে। তারা নিশ্চয়ই ভাবছে এইবার অত্যন্ত বিপাকে পড়েছে মেয়েটা এবং এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আগেই আরও দু-চারটে মুখরোচক সংবাদ তারা আশা করবে। লোকলজ্জার আশঙ্কায় অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল শ্রীলা। শ্রীলা বাড়ী থেকে বেরুনো বন্ধ করে দিল। ওর প্রতি মুহূর্তে ভয় পাড়ার

পরিচিতা মহিলারা ওর দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন। কিম্বা পাড়ার রোয়াকে বসা ছেলেরা ওকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। এই অহেতুক আশঙ্কা আর ভীতির শিহরে শ্রীলা অত্যন্ত নিঝুম হয়ে পড়ল। তবু নিস্কৃতি নেই। যাঁরা বাসায় আসেন তাঁরাও সমবেদনার বাণী শুনিয়ে যান। যেন তীরের মত বেঁধে ওদের কথাগুলো। তবুও কিছু করার নেই। মাঝে মাঝে শ্রীলার মনে হয় পালিয়ে যায় এখান থেকে। দূরে বহুদূরে, যেখানে নিখিলেশের স্মৃতি ওকে দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে ফিরবে না, যেখানে প্রতিবেশীদের কটূক্তি ওর কানে পৌঁছাবে না। যেখানে ভুবনকাকাদের কুশ্রী সন্দেহ টুঁটি টিপে ধরবে না। কিন্তু সেখানেও ভয়। শ্রীলার সাময়িক অন্তর্ধানে যদি ভুবনকাকার আশঙ্কাটাই লোকে মনের মধ্যে সত্য করে তোলে ?

তুই বরং আমার ওখানে কিছু দিন থাকবি চল, রাণী মাসীমা বলেন।

শ্রীলা মুখ নীচু করে বলে, না।

হল কি মেয়ের, স্বভাবসিদ্ধ তরলতার সঙ্গে রাণী মাসীমা বলেন, এতে এতো অধীর হওয়ার কি আছে ?

সেকথা নয় মাসীমা, শ্রীলা বলে, আমার ভাল লাগছে না।

সেই জন্যই তো নিয়ে যেতে চাইছি। এখানে এই ভাবে থাকলে সারা পৃথিবী তোমার কাছে নিরানন্দ মনে হবে।

না মাসীমা, তুমি রাগ কোর না লক্ষ্মীটি, এখন আমার কিস্সু ভাল লাগছে না।

এখন কয়েকদিন কোন কিছু না ভেবে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে চায় শ্রীলা। মন নাকি কোন সময়ে শূন্য হয় না, শ্রীলা ভাবে, এমন কি ঘুমের সময়েও নয়। শুধু মাত্র—শ্রীলার মাথাটা ঝিম ঝিম করে—শুধু মাত্র মৃত্যুর পরে মনের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

রাণী মাসীমা থমথমে মুখে বললেন, শ্রীলা মনে রেখো, জীবন একটা মেলা, এখানে হাঁটতে হাঁটতে অনেক অপরিচিতের সঙ্গে

তোমার পরিচয় হবে, অনেক পূর্ব পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। অনেক পরিচিতেরা হারিয়ে যাবে। কারো কথা হয়ত তোমার মনে থাকবে, কেউ বা মন থেকে মুছে যাবে। সকলের কথা সব সময়ের জন্য মনে রাখতে গেলে শুধু অশান্তিই বাড়বে। যে তোমার জীবন থেকে সরে গেছে তাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করো। যদি এই ব্যর্থতার জন্য এ ভাবে বিচলিত হয়ে পড়ো তাহ'লে দুনিয়ার সব দরজাই তোমার কাছে রুদ্ধ হয়ে যাবে। এবং ভগবান ও তোমায় ক্ষমা করবেন না, কারণ আত্ম অপচয়ের কোন অধিকার তোমার নেই।

কিন্তু আমি যে আর পারছি না মাসীমা। শ্রীলার চোখ জলে ভরে আসে। একটা কান্না গলার কাছে আটকে থাকে।

মনে রেখো, রাণী মাসীমা কঠিন স্বরে বললেন যুগ-যুগান্তর ধরে শবরীরাই রামচন্দ্রের জন্য অনন্তকাল প্রতীক্ষার ব্রত নিয়েছে। কোন পুরুষ তার জীবনের আশা, আকাঙ্খা রূপ যৌবন বিসর্জন দিয়ে প্রেমাস্পদার জন্য একা ক্লিষ্ট জীবন যাপন করেনি। কাজেই তোমার ভূমিকা অত্যন্ত কঠিন। যদি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করে থাকো নিখিলেশের ভালবাসায় ছলনা নেই, তাহলে তোমাকে তার জন্যই প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে। সে প্রতীক্ষা যদি যুগ-যুগান্তর ব্যাপী হয় তবুও।

কিন্তু শ্রীলা তবুও গেল না রাণী মাসীমার সঙ্গে। লোকলজ্জা, অপরের করুনা আর দাক্ষিন্যের বেদনা ছাড়াও আরও একটা ভয় খেলা করছিল শ্রীলার মনের মধ্যে। ওর অন্যত্র বাস নিয়ে পাড়ায় যে জনশ্রুতি ফেনিয়ে উঠবে তাতে ওদের পারিবারিক মর্য্যাদাই ক্ষুন্ন হবে তাই নয়। শ্রীলার পক্ষেও তা সহনীয় হবে না। কারণ শ্রীলার দার্জিলিং প্রবাস, নিখিলেশের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা, পরে নিখিলেশদের কোন সমাচার না পাওয়া এবং অবশেষে তার সাময়িক অন্যত্র বাস, ইত্যাদি নিয়ে ঘটনা ও সংলাপের কার্য্য কারণ যোগে বেশ একখানা মুখরোচক কাহিনী তৈরী করা যায় এবং ফল একটা

চিরকালের কলঙ্কের ফিসফিসানি। না, সে বড়ো লজ্জার ব্যাপার হবে। তা নাহলে ও সুনীতের সঙ্গেই যেতে পারত। সুনীত ও ওকে কিছুদিনের জন্য বর্ধমানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

চল না ছোট বর্ধমানে, বলেছিল সুনীত দেখবি মন আর স্বাস্থ্য দুই একেবারে ঝরঝরে হ'য়ে যাবে।

শ্রীলা হেসে বলেছিল মন আর স্বাস্থ্য দুইই? কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের কি কোন অবনতি দেখছ?

সুনীত। তা অবশ্য দেখছি না। তবে আশঙ্কা করছি এর পরের সপ্তাহে যখন আসব তখন দেখতে পাব।

শ্রীলা। তুমি ডাক্তার না গণৎকার?

সুনীত। ও দুটোর একটাও না হ'য়েও অতি সহজেই বলা যায় যে তোমার মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে অত্যন্ত সাংঘাতিক ভাবে এবং তার ফলে দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি অবশ্যম্ভাবি। অতএব—

শ্রীলা। অতএব তোমার মত একজন ব্যচিলার, যার না আছে চাল না আছে চুলো তার সংসারে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলা। এতে আমার চেয়ে তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতিই হবে বেশী।

তোকে হাঁড়ি ঠেলতে হবে একথা কে বলল? আমার শ্রীনিতাই আছে সকল কাজের কাজী। রান্নায় দ্রৌপদীকেও হার মানায়, কাজে বিশ্বকর্মা। সে থাকতে তোমাকে রান্না করতে হবে কেন?

থাক ঢের হ'য়েছে। শ্রীলা বলল, তোমার চাকরের পরিচর্য্যায় যদি আমাকে থাকতে হয় তাহ'লে ওখানেই কবরের মাটি কিনতে হবে।

তাছাড়া কত দেখার জায়গা আছে জানিস, সুনীত শ্রীলাকে উৎসাহিত করতে চায়। দুর্গাপুর, মাইথন, রাণীগঞ্জের কলিয়ারী, বর্ধমানের ক্ষেতে ক্ষেতে সোনালী ফসল, কল্যাণেশ্বরীর মন্দির, চিত্তরঞ্জন—

এবার প্রভৃতি বলো ছোড়দা।

শ্রীলার কথা গায়ে না মেখে সুনীত ওর বর্ণনা আরও মনো গ্রাহী করবার চেষ্টা করে, রোপওয়ে, দামোদরের এপার-ওপার বান। আর কল্যাণেশ্বরীতে যা মানত করবি তাই পাবি।

শ্রীলা আনমনে বলল যা মানত করব তাই পাবো?

লোকে তো তাই বিশ্বাস করে। চল না মটর সাইকেলে চড়িয়ে সব জায়গাগুলো ঘুরিয়ে আনব। দেখবি কি থ্রীল।

শ্রীলা শিউরে উঠে বলল বাবা, ওই আশি মাইল স্পীডের থ্রীল; ও আমার সইবে না। তুমি ক্ষান্ত দাও।

সুনীত বিরক্ত হয়ে বলল তোরা অত্যন্ত unsportsman like। তোদের জীবনে কোন থ্রীল নেই।

কিন্তু আসল কারণ তা নয়। যে কারণে রাণী মাসীমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে শ্রীলা সেই একই কারণে সুনীতের সঙ্গে বর্ধমানে যেতেও রাজী হয়নি।

কথটা শেষ পর্য্যন্ত ব্রজবিলাসের কানে পৌছাল। মেজবৌদিই বললো ব্রজবিলাসকে। অত্যন্ত লজ্জিত হলেন ব্রজবিলাস। ইতিহাসের পাতা থেকে বাস্তবিকই মনকি খানিকক্ষণের জন্য বিক্ষিপ্ত হ'ল।

না, না, এতো ভালো কথা নয় ব্রজবিলাস বললেন, কারো সঙ্গে না মেশা, ঘর থেকে না বেরোন, এসব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কথা। এর থেকে অত্যন্ত গুরুতর রোগের উৎপত্তি হতে পারে। এমন কি মেলাঙ্কোলিয়াও হ'তে পারে। আর মেলাঙ্কোলিয়া সাংঘাতিক অসুখ। তুমি ওকে বোঝাও বৌমা।

যশোমতীর ফটোটা পালকের ঝাড়ন দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে মেজবৌদি বলল ওযে কারোই কথাই শুনছে না। রাণী মাসীমাও ওকে রাজী করতে পারেন নি। সুনীত ওর সঙ্গে বর্ধমান যাওয়ার জন্য বলেছিল ও তো হেসেই উড়িয়ে দিল।

তাহলে ওকে বরং পুরুলিয়াতে উর্মীলার কাছেই পাঠিয়ে দাও।

কিন্তু ওযে বাড়ী ছেড়েই বেরোতে চায় না। কলকাতা ছাড়া তো দূরের কথা।

ব্রজবিলাস কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন ওকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

ব্রজবিলাসের ডাক শ্রীলার কাছে নতুন নয়। কারণে অকারণে প্রায়ই ডাকেন ব্রজবিলাস। যশোমতীর মৃত্যুর পর থেকে একটা অদৃশ্য অপরাধবোধের অসুখে ভোগেন ব্রজবিলাস। মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি বুঝি পিতার কর্তব্য যথাযথ পালন করছেন না। তাই আপনজনকে কাছে ডেকে মনের কাছে সান্তনার কৈফিয়ত তৈরী করেন নিজেরই অবচেতনে।

শ্রীলা ভেবেছিল বুঝি বা তেমনি কোন কারণে ডেকেছেন ব্রজবিলাস। ব্রজবিলাসের চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে তাঁর অত্যন্ত কাছে ঘন হ'য়ে বসল। যেমন ছোটবেলায় তাঁর আদরের সবটুকু উত্তাপ পাওয়ার জন্য ব্রজবিলাসের কাছ ঘেঁসে বসত শ্রীলা।

শ্রীলার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রজবিলাস বললেন, তুমি অত্যন্ত রোগা হয়ে গেছ শ্রীলা।

শ্রীলা একটু চমকে বলল, কই না তো।

আমার চোখকে কি ফাঁকি দিতে পারবে? স্নেহে আর্দ্র হয়ে উঠলেন ব্রজবিলাস।

শুনলাম তুমি নাকি আজকাল বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছো?

আমার ভালো লাগে না।

ভালো না লাগাটা এক প্রকারের অসুস্থতা। সঙ্গ বিমুখতা দেহ ও মনকে অচল করে তোলে। কাজেই তোমার ভাল না লাগাটা ভাল মনে নিতে পারছি না।

শ্রীলা মুখ নীচু করে কড়ে আঙ্গুলে বেণীটা জড়াতে লাগল।

ঘরময় সন্ধ্যা ধূপের গন্ধ। শ্রীলার মাথাটা যেন ঝিমিয়ে আসে। শ্রীলা ব্রজবিলাসের চুলের মধ্যে বিলি কাটে।

ব্রজবিলাস আবার বলেন, শুনছি তুমি নাকি বাইরে বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছ। এরকম গৃহ নির্বাসনে থকলে নিজের সত্বা হারিয়ে ফেলবে। এবং একবার যদি বিষন্নতার কাছে নিজেকে সমর্পন করো তাহলে জীবনে কোনদিনই মুক্তি পাবে না। এর চেয়ে আমি বলি কি, তুমি বরং কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়িয়ে এসো।

কোথায় ক্লান্ত ও বিষন্ন চোখ মেলে শ্রীলা ব্রজবিলাসের কাছে আশ্রয় চায়।

রাণুর ওখানে যেতে পারো। ও তোমায় নিয়ে যেতে চায়।

রাণী মাসীমার ওখানে? যেখানে একই বাড়ীতে স্বামি স্ত্রী বলে পরিচিত দুটি বিপরীত ধর্মী মানুষের সহাবস্থান? যেখানে দুটী কাছের মানুষের মধ্যে সমুদ্রের ফারাক? সেখানে গিয়ে শ্রীলা টিকবে কি করে?

তাহলে সুনীতের ওখানে যাও।

ছোড়দার নিজেরই কোন ঠিক নেই নেই কোন স্থায়ী আস্তানা।

তাহলে পুরুলিয়াতে উর্মিলার কাছে যেতে পারো। কথাটা মনে ধরল শ্রীলার। মেজবৌদি কিছুদিন থেকে এসেছে উর্মিলাদির বাসায়। ওর কাছে উর্মিলাদির বাসার মনোরম বর্ণনা শুনেছে শ্রীলা। উমর্লিাদির নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। স্বামি, এক মেয়ে আর এক দেওর নিয়ে উমর্লিাদির সংসার। উর্মিলাদির স্বামি পরিতোষ পুরুলিয়ায় একজন বিশিষ্ট উকীল। ফোজদারীতে বিশেষ সুনাম তাঁর। শহরের উপকণ্ঠে বাড়ী করেছেন। দেওর ডাক্তার। তবে রোগের চেয়ে রোগের জীবাণু সন্ধানেই বেশি অনুরাগী। অতএব ওবাড়ীর চরিত্রগুলি শ্রীলার নির্জনতাবাসের পরিপন্থী হবে না। উর্মিলাদির দেওরের সঙ্গে শ্রীলার বিয়ের জন্য একসময় উভয় পক্ষই উৎসুক

হয়েছিলেন। সেই জন্যই কিছুটা সংকোচ বোধ করছিল শ্রীলা। কিন্তু শ্রীলার মনে হল রাণীমাসীমা বা সুনীতের চাইতে উর্মিলার ওখানে যাওয়া ভালো।

শ্রীলা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বলল আমি উর্মিলাদির ওখানেই যাবো। তুমি লিখে দাও বাবা।

ব্রজবিলাস প্রশান্ত দৃষ্টিতে শ্রীলার দিকে তাকিয়ে বললেন আচ্ছা।

বাড়ীটার নাম ছায়ানিলয় শিরীষ আর আমলকীর কোলে বাড়ীটা যেন সারাক্ষণই ছায়াস্নাত। ষ্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে। বাজার ছাড়িয়ে, কোর্ট কাছারী পার হয়ে, রাঁচী রোডের ওপর প্রায় সার্কিট হাউসের গা ঘেঁষে বাড়ীটা। গেটের দুপাশে অজস্র অপরাজিতা আর বোগেনভিলিয়া। মরাম বিছানো একফালী রাস্তা সিঁড়ি পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে। বারান্দার দক্ষিণ কোনে জাফরী কাটা. তার পাশে আলো করা একটা স্থলপদ্মের গাছ।

শ্রীলা যখন গাড়ী থেকে নামল স্থলপদ্মের দুধসাদা পাপড়ীগুলো সবে রং বদলাতে সুরু ক'রেছে। হাল্কা গোলাপী রং। পরিতোষ নিজেই গাড়ী নিয়ে শ্রীলাকে আনতে গিয়েছিল ষ্টেশনে। বাড়ীটার বাইরের রূপ দেখে শ্রীলা মুগ্ধ হ'ল। দক্ষিণ দিগন্ত জুড়ে পাহাড়ের সারি। নীল। শুধু নীল। দিগ্বলয়ে নিলিমায় বিলীন। অজান্তেই শ্রীলার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল বাঃ চমৎকার।

গাড়ীটা গ্যারেজে তুলতে তুলতে পরিতোষ বলল, তোমার পছন্দ হয়েছে?

শ্রীলা হাসল। আপনি যেখানে থাকেন সে জায়গা ভাল না হয়ে পারে।

এতবড় সার্টিফিকেট তো কেউ আমাকে দেয়নি। এক তুমি ছাড়া। এমন কি আমার সহধর্মিনী—সেও না।

পরিতোষের মুখে সব সময়েই একটা পরিতৃপ্তির হাসি। এরা বোধহয় খুব সুখী, শ্রীলা ভাবল।

গাড়ীর আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে এল উর্মিলা। পিছনে পিছনে ওর বাচ্চা মেয়ে চন্দনা।

চন্দনাকে কোলে তুলে নিল শ্রীলা।

ইস, তোকে এখনও বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে? তোমার কি আক্কেল বলো তো?

উর্মিলার ভর্ৎসনায় বিন্দুমাত্রও লজ্জিত না হয়ে পরিতোষ বলল বে-আক্কেলটা আমার না তোমার বোনের? সে যদি তোমার বাড়ীর রূপে মোহিত হয়ে ভেতরে ঢোকার কথা ভুলে গিয়ে থাকে তাহলে আমি কি করব বলো?

বে-আক্কেল তোমারই যে আমার বোনকে এখনও ঘরের মধ্যে ঢোকাতে পারলে না। আয় শ্রীলা, ভেতরে আয়।

উর্মিলার মেয়ে চন্দনা ওর কোলে চড়ে ওর বেণীটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছিল। উর্মিলা মেয়েটাকে শ্রীলার কোল থেকে নিয়ে বলল, এখন একটু ঝাড়া হাত পা হয়ে বিশ্রাম কর। যা জানি। মাত্র দু'শ মাইল, কিন্তু ট্রেনের ধকল সইতে হবে সারা রাত।

সত্যি। দূর বেশী নয়। কিন্তু প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সহৃদয়তার অন্ত নেই। প্রতিটি স্টেশন ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে। আর যদি গতির আরাম না থাকে তাহলে ঘুমও আসে না। বলতে গেলে প্রায় সারা রাতই বিনিদ্র কাটিয়েছে শ্রীলা। কিন্তু এখনই বিশ্রাম করতে ইচ্ছে করল না শ্রীলার। বিশ্রাম মানেই তো ঘুম। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে বলল, আয় না ছোড়দি, একটু গল্প করি।

উর্মিলা একগাল হেসে বলল, ক্ষেপেছিস। আমার কি এখন গল্প করার সময় আছে? একজন কোর্টে যাবে, তার জন্য ভাত চাই ন'টায়, আর একজন সকাল থেকে চা না খেয়ে ল্যাবরেটারীতে বসে মাইক্রোসকোপে বিশ্বনিখিল দেখছে, তার জন্য ব্রেকফাষ্ট দশটায়।

তারপর হাবি-যাবি কাজ। দেখ না, কি সুখেই আছি তোর জামাই-বাবুর সংসারে।

শ্রীলার কিন্তু মনে হল, উর্মিলা সত্যি খুব সুখে আছে একটি সুখী ও পরিতৃপ্ত সংসারের কর্ত্রী হয়ে।

কিন্তু তোর আরেকজনটি কে ছোড়দি?

উর্মিলা একটু মুচকি হেসে বলল, আমার দেওর। একটি বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। এখানে থাকতে থাকতে পরিচয় পাবি। তারপর দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, তুই বরং এখন একটু বিশ্রাম কর, আমি সংসারের টুকিটাকি কাজগুলো সামলে সারা দুপুর তোর সঙ্গে গল্প করব। এখন বরং চন্দনা তোর কাছে বসুক।

কিছুই নিজের হাতে করতে হয় না উর্মিলাকে। ঠাকুর, চাকর, ঝি সবই আছে তবু উর্মিলার কাজের অন্ত নেই। এক ধরনের মানুষ আছে কাজই যাদের সুখ, কাজই যাদের বিশ্রাম।

চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিল শ্রীলা। দূরে একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে। কি স্বচ্ছ তার জল। পাড়ের গাছগুলো যেন তার বুকে মুখ দেখছে। আরও দূরে একফালী অরণ্যের ইশারা। তারপরই সুরু হয়েছে পাহাড়ের সারি। আদিগন্ত শুধু পাহাড়। যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

চন্দনা গুটি গুটি এসে শ্রীলার কোল ঘেঁষে দাঁড়াল। কাজল পরা ভাসা ভাসা চোখ চোখ দুটো তুলে বলল, তুমি আমার ছোট মাসি, তাই না গো?

শ্রীলা চন্দনাকে কোলে তুলে গাল দুটো টিপে দিয়ে বলল, হ্যাঁ, তাই তো।

তুমি বুঝি নতুন এসেছো?

শ্রীলা ঘাড় নাড়ল।

তাহলে তো তুমি পুরুলিয়ার কিছুই চেন না?

না। তুমি চিনিয়ে দাও।

গম্ভীর মুখ করে চন্দনা বলল, আমি কি আর অতশত জানি ছাই। তুমি বরং মণিকাকুকে বোল, তোমাকে সব চিনিয়ে দেবে।

তুমি বুঝি কিছু জানো না?

কিছু কিছু জানি। ওই যে দেখো না, ওই পুকুরটার নাম সাহেব বাঁধ। ওর মাঝে দুটো দ্বীপ আছে।

তাই নাকি? শ্রীলা আশ্চর্য হওয়ার ভাণ করল।

আর ওই যে পাহাড়গুলো দেখছ, ওগুলো আড়শার পাহাড়। এই সামনের রাস্তাটা কোথায় গেছে জানো?

শ্রীলা ঘড়ে নাড়লো, না তো?

এটা গেছে রাঁচী। দেখবে কত বাস ট্রাক আর ট্যাক্সি যায় সারাদিন।

শ্রীলা চমৎকৃত হয়ে বলল, বাব্বাঃ চন্দনা এতও জানো? চন্দনা ঠোঁট উল্টে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, আমি আর কি জানি, মণিকাকু কত জানে। কত দেশ-বিদেশের গল্প বলে আমাকে।

তাহলে তো তোমার মণিকাকু দারুণ বিদ্বান লোক?

সুর মিলিয়ে চন্দনা বলল, মণিকাকু সারাদিন পড়াশুনা করে, আর কি একটা যন্ত্রের চোখ লাগিয়ে কি সব দেখে।

তাহলে তোমার সঙ্গে গল্প করে কখন?

মণিকাকুর কাছে গেলেই গল্প করে। তুমি যাবে?

না-না, আমি সারারাত জেগে এসে এসেছি। এখন একটু বিশ্রাম করব।

চল না ছোট মাসি। চন্দনা জিদ ধরল, দেখবে মণিকাকু তোমার সঙ্গেও কত গল্প করবে। কত ভাল লাগবে তোমার।

না চন্দনা, লক্ষ্মীটি, আজ থাক। মণিকাকু তো বাড়ীতেই রয়েছেন। পরে আলাপ করা যাবে'খন।

মণিকাকু তো সারাদিনের মধ্যে মাত্র একবার আসে ভাত খেতে। তুমি যদি তখন ঘুমিয়ে পড়ো?

না না, ঠিক জেগে থাকব, তুমি দেখো।

চন্দনার প্রত্যয় হল না। না বাপু, তুমি এখনই ঘুমে নেতিয়ে পড়ছ। আমি বরং মণিকাকুকেই ডেকে আনি। চন্দনা ছুটে বেরিয়ে গেল।

অত্যন্ত বিব্রত হয়ে শ্রীলা ডাকল চন্দনা. শুনে যাও লক্ষ্মী মেয়ে।

সে ডাক চন্দনার কানে পৌঁছাবার আগেই চন্দনা ল্যাবরেটারীর বারান্দায়।

এ অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার হল। শ্রীলা ভাবল, ভদ্রলোক কি মনে করবেন। তিনি নিশ্চয়ই ভাববেন, অন্ততঃ ভাবতে বাধা নেই তাঁর, যে শ্রীলাই তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। শ্রীলা অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ করল। শ্রীলা ভাবছিল বারান্দা থেকে উঠে রান্নাঘরে উর্মিলার কাছে চলে যাবে কিনা সেই সময়েই গেটের মুখে দুজনাকে দেখা গেল। মনীশকে আগে কোনদিন দেখেনি। ওর সম্বন্ধে দূর থেকে নানান কথা শুনেছে। বারান্দা থেকে ওর লালচে চুল আর পুরু লেন্সের চশমাটার আভাসে ওর চরিত্রগত মিল খুঁজে পেল যেন। ওর হাঁটার ভঙ্গীকেও একটা বেহেমিয়ানা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

বারান্দায় শ্রীলাকে দেখে অত্যন্ত অপ্রতিভ ভাবে মনীশ বলল, কিছু মনে করবেন না। চন্দনা আমাকে একটি ভুল সংবাদ পরিবেশন করার জন্য আপনাকে বিব্রত করলাম। আমি সত্যিই লজ্জিত।

এবার শ্রীলা সত্যিই বিব্রত হল। লজ্জা মেশানো গলায় বলল, না না, আমি বিব্রত হইনি মোটেই।

চন্দনা রেলিং এ হেলান দিয়ে মিটিমিটি হাসছিল, আর একটা অপরাজিতার পাপড়ী ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছিল মাটিতে।

ওর দিকে একবার তাকিয়ে মনীশ বলল, চন্দনা আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে একটা নতুন জিনিষ দেখাবে বলে। এই রকম নতুন জিনিস চন্দনার পাল্লায় পড়ে আমাকে প্রায়ই দেখতে হয়। জিনিস মানে, বাবুই পাখীর বাসা, রঙীন প্রজাপতি অথবা হঠাৎ ফোটা

ডালিয়া। কিন্তু আজ যে ও আমাকেও জিনিসের পর্যায়ে ফেলে আমাকে এখানে ডেকে আনবে আমি তা বুঝতে পারিনি। অত্যন্ত সংকোচ বোধ করছি।

শ্রীলার খেয়াল হল মনীশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। শ্রীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কিন্তু একি আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, বসুন।

মনীশ পাশে খালি চেয়ারটা টেনে কাছে এনে শ্রীলাকে বলল, আপনি বসুন। আমি বসছি। ওরা মুখোমুখি বসল। চেয়ারের উপর আধশোয়া ভঙ্গীতে প্রায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে মনীশ বলল, আপনি আসবেন, বৌদির কাছে শুনেছিলাম। এবং আজই আপনি আসবেন একথাও বোধহয় বৌদি আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু—

কিন্তু কি?

ভুলে গিয়েছিলাল। মানে সবকিছু আমি ঠিক মনে রাখতে পারি না।

তাতে কি হয়েছে। আমি তো এমন কিছু ভি. আই. পি. নই যে মনে রাখতে হবে।

তা নয়। মনীশ বলল, সমাজে বাস করতে গেলে সামাজিকতা-গুলো মেনে চলা দরকার। ভুলে যাওয়াটা অন্যায় নাহলেও নয়, ত্রুটী। অথচ আমি এগুলো ভুলে যাই। ভদ্র সমাজে আমি একেবারে অচল হয়ে গেছি।

মনীশের কথায় ক্ষোভের আভাস।

চন্দনা বাগানে ছুটে ছুটে প্রজাপতি ধরছিল। শীতের রোদ্দুর শ্রীলার মুখের উপর পড়ছিল। এই কবোষ্ণ আলোকটুকু বেশ ভাল লাগছিল শ্রীলার। ওর নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল। গালে ঈষৎ লালীমার আভাস। অন্যমনস্ক ভাবে শ্রীলার মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিল মনীশ। শ্রীলা লজ্জিত হয়ে সরে বসল। ওর মুখের ওপর থেকে রোদটুকুও সরে গেল।

চন্দনা আমাকে ওই পাহাড়গুলো চেনাচ্ছিল। ও আমাকে বলল, আপনি নাকি অনেক বেশি জানেন। তাছাড়া উর্মিলার কাছেও শুনেছি পুরুলিয়ার নদী, পাহাড়, আর জঙ্গলের সঙ্গে নাকি আপনার নিবিড় পরিচয়।

একটু হেসে মনীশ বলল, ওরা বাড়িয়ে বলেছে। দেখুন, নদী পাহাড়, অরণ্য, এসব আমার ভাল লাগে। মানুষের সঙ্গও বোধ করি এত প্রীতিকর নয়। তাছাড়া যেখানে বাস করি তার প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে কর্তব্য হিসাবে সকলেরই কিছু কিছু জানা উচিত। আমিও তার বেশি কিছু জানি না।

আমার বেশ ভাল লাগছে এখানে এসে। চারিদিক কেমন খোলামেলা। এখানে আকাশ কত নীল। এখানের বাতাসে কেমন একটা ভেজা ভেজা সুগন্ধ। দিঘীর জল কত স্বচ্ছ। যেন সন্দেহ হয় আকাশটা ওপরে কিম্বা নীচে।

আপনি তো সুন্দর কথা বলেন। আমি আবার ভাল বলতে পারিনে। আমি শুধু দেখি আর শুনি। নির্জন দুপুরে ল্যাবরেটেরীতে কাজ করতে করতে ঘুঘুর ডাক শুনি। সামনের রাস্তা দিয়ে হাঠুরেদের গরুর গাড়ী যায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে। ফেরীওয়ালাদের হাঁক শুনি। পাখনা ঝটপট করতে করতে ডাহুক উড়ে যায়। কেমন যেন একটা ঘুম ঘুম ভাব। সবে মিলে দুপুরটা মনে হয় একটি সুন্দর কবিতা।

শ্রীলা একটু হেসে বলল, কিন্তু রোজ রোজ একই দৃশ্য দেখতে কি ভাল লাগে? পুরোন হয় না?

মনীশ এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে বলল, এ কথাটা আমিও প্রায়ই ভেবে দেখেছি জানেন। আমার মনে হয় মানুষের স্পষ্ট সৌন্দর্য পুরোন হয়ে যায় কিন্তু যা প্রকৃতির দান তা কোনদিন পুরোন হয় না। পুরোন হয় না প্রতিদিনের প্রভাত সূর্যের রং। পুরোন হয় না পুবালী বাতাস। পুরোন হয় না নীল নীল ঘাসের ফুল।

শ্রীলা সম্মোহিতের মত শুনছিল। মনীশের সৌন্দর্যের সত্তাটা ব্যঞ্জনাময়। তা উপলব্ধি করার জন্য একটি সংবেদনশীল মনের প্রয়োজন। এই মুহূর্তে মনীষের সঙ্গে প্রীতমের সাদৃশ্য খুঁজে পেল শ্রীলা। প্রীতমও একদিন বলেছিল যা সুন্দর তাই শাশ্বত। পুরোন হয় আমাদের মন। জীর্ণ হয় আমাদের উপলব্ধি ও চেতনা।

আপনি যদি এখানে কয়েকদিন থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে কয়েকটা লোকেশনে নিয়ে যেতে পারি। এই উপলব্ধিগুলো সেখানে হৃদয় দিয়ে অনুভব করবেন। আমার বিশ্বাস আপনার ভাল লাগবে। অবশ্য যাঁরা কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দে তাঁদের কাছে কলকাতার বাইরে গেলেই ভাল লাগে। তাছাড়া বাংলা দেশের একটা নিজস্ব রূপ আছে। কিন্তু বাংলার এই প্রান্তভূমিতে আপনি আরও কিছু পাবেন। নতুন কিছু। এখানে ধরিত্রীর হর-পার্বতী রূপ। কঠিনে কোমলে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। রূপ এখানে অপরূপ হয়েছে। একদিকে ছোট নাগপুর উপত্যকার রুক্ষ উষর প্রান্তর গহন অরণ্য, ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি, আর একদিকে উর্বরা বাংলার শস্য শ্যামলা রূপ, নীল আর সবুজের সমহারোহ—কিন্তু আপনি বিরক্ত বোধ করছেন না তো?

বিরক্তি নয়। সারা রাত্রির ক্লান্তিতে শ্রীলার চোখ দুটো ঘুমের ভারে নত হয়ে আসছিল।

না না, আমি মোটেই বিরক্ত হচ্ছি না। শ্রীলা বলল, আপনি চলুন। আপনি বুঝি প্রচুর ঘুরেছেন?

প্রচুর ঘুরতে আর সময় পেলাম কোথায়। ছেলেবেলায় আমার মাথায় মাঝে মাঝে ভুল চাপত। সাথীসঙ্গ নিয়ে বেরিয়ে যেতাম নিরুদ্দেশ হওয়ার বাসনা নিয়ে। মাঠ ঘাট পেরিয়ে চলে যেতাম সেখানে পাহাড়ের কোলে নিঃঝুম গাঁয়ে ঢেঁকিতে ধান কুটছে চাষী বৌ, বুড়ো সাঁওতাল তেঁতুল গাছের ছায়ায় হাঁড়িয়ার নেশায় বেঘোর, কোমরে ঘুনসি পরা ছেলের দল হল্লা করতে করতে মাঠে মহিষ

চরাচ্ছে। ওদের সঙ্গে মিশে যেতাম। রাত কাটাতাম কোন চাষীর বাড়ীতে অথবা কোন সাঁওতালের গোয়াল ঘরে। ওরা আদর করে চিঁড়ে মুড়ি খাওয়াত। তখন ওরা কত আপনার ভাবত। আজ কত দূরে সরে এসেছি। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে।

সেটা লক্ষ্য করে শ্রীলা বলল, দূরে সরে গেছেন কেন? আর কি ওদের মাঝে ফিরে আসতে পারেন না?

উদাস কণ্ঠে মনীশ বলল, বোধ করি না। দেশে আজ অনেক সামাজিক আর ওরা আমাকে আপনার বলে ভাবতে পারবে না। আর আমিও ইচ্ছে করলেই ওদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না। নানান প্রশ্ন আর নানা কৈফিয়তের অকারণ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে মন চায় না। এইটেই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি।

চন্দনা প্রজাপতির পেছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। গালে হাত দিয়ে পাকা মেয়ের মত বলল, মণিকাকু, এই না তুমি বললে তোমার মোটেও সময় নেই?

হ্যাঁ, তাতো বলেই ছিলাম।

তাই বুঝি ছোট মাসির সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছ বসে বসে।

মনীশ জিভ কেটে বলল, ইশ, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। আমার মনেই ছিল না।

গল্প করতে বসলে তো কিছুই মনে থাকে না তোমার। তুমি তো নাওয়া খাওয়াও ভুলে যাও।

শ্রীলা আর মনীশ একসঙ্গে হেসে উঠল।

সত্যি ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। মনীশ বলল, আপনাকে এতক্ষণ বিরক্ত করলাম। আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্লান্ত।

ক্লান্তি শ্রীলার সারা অঙ্গে। ক্লান্তি ওর চোখের তারায়। শ্রীলা শুধু হাসল।

মনীশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তাহলে চলি।

শ্রীলা ঘাড় নাড়ল। মনীশ চলে যাওয়ার পর ফিস ফিস করে চন্দনা বলল, দেখলে তো ছোট মাসি, মণিকাকু কত জানে।

মণিকাকুর পাণ্ডিত্য গরবিনী ভ্রাতুস্পুত্রীর গাল দুটো টিপে শ্রীলা বলল, ঠিকই বলেছ তুমি। উনি অনেক জানেন।

এবার একটু চাপা স্বরে চন্দনা বলল, যাই বলো বাপু, মণিকাকু কি বকবকই না করতে পারে। আমার তো ঘুম এসে যায়।

ভোরের সূর্য্য যখন আভিশার পাহাড়ে আলোর বন্যা হয়ে ঝরে পড়ে, সাহেব বাঁধের অর্জ্জুন গাছের শাখায় শাখায় ডাহুকের ডানায় ডানায় যখন ঘুমের আমেজ, রাত্রির শিশিরবিন্দু যখন সুভাষ পার্কের ঘাসের শীষের ওপরে হীরের মত টল টল করে, ছায়ানিলয়ের মানুষগুলো তখন গভীর নিদ্রায় অচেতন।

শুধু এ বাড়ীর খেয়ালী ছেলেটা আলো জেলে ল্যাবরেটারিতে বসে কি সব করে আর ছায়ানিলয়ের বুড়ো দারোয়ান কানে সুতো জড়ানো চশমা পরে তুলসিদাসি রামায়ণ পড়ে সুর করে।

তারপর সূর্য্যের আলো যখন হেমন্তের পাকাধানের মত রঙ্গ নিয়ে ছাদের আলসে আর জানালার কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে তখন একে একে সবাই জেগে ওঠে। বামুন দিদি, সাবিত্রী ঝি এবং চন্দনা। তারপর ছায়ানিলয়ের সূর্য্যের আলো পায়ে পায়ে ঘরে ঢোকে। চন্দনা সারা বারান্দায় ছুটোছুটি করে। সাবিত্রীর বাসন ধোয়ার চুং চাং শব্দ ভেসে আসে। আর উনুনে আঁচ দিতে দিতে যখন ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে তখন বামুন দিদি আপন মনেই গজর গজর করে। পাহাড়তলির বনানীগুলো ঝলমলিয়ে ওঠে। যেন একটা হঠাৎ খুশির আনন্দ কানায় কানায় ভরে ওঠে।

ভোর বেলায় হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল শ্রীলার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ওর হঠাৎ ভাল লাগা মন চঞ্চল হয়ে উঠল। শ্রীলা বিছানা ছেড়ে বেসবাস বিন্যস্ত করে বাইরে বেরোল। বেড়াতে

বেড়াতে অনেক দূরে এসে পড়েছিল শ্রীলা। ওকমান পুর ছাড়িয়ে লেপার এ্যসাইলাম এর কাছাকাছি। ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে এক ফালি পায়ে চলা রাস্তা। দুপাশে ঘাস। ঘাসের শীষে রাত্রির শিশির মুক্তোর মত টলটল করছিল। গ্রামের মেয়েরা কলসি কাঁখে পুকুরে জল আনতে যাচ্ছিল। আড়চোখে কেউ কেউ চোখে কিছুটা বিস্ময় নিয়ে তাকাল ওর দিকে। শ্রীলার ভারী ইচ্ছে করছিল ওদের সঙ্গে কথা বলতে, আলাপ করতে। একটা সাত আট বছরের মেয়ের সিঁথীতে সিঁন্দুর দেখে বেশ মজা লাগল শ্রীলার। আরও পাঁচজন বৌঝিদের সঙ্গে বেশ ভারিক্কী চালে পা ফেলে জল আনতে যাচ্ছিল মেয়েটি। ঝম ঝম করে পায়ে মল বাজিয়ে। সিঁন্দুরের জোরেই ও বোধ হয় এদের জলকে যাওয়ার সাথী হতে পেরেছে। শ্রীলা মনে মনে হাসল। বিরাট বড় দীঘি। নাম রাণী সায়র। ভোরের হাওয়ায় পুকুর পাড়ের গাছের পাতাগুলো কাঁপছিল শিরশির করে। জলের বুকেও সে কাঁপন ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘাটে আছড়ে পড়ছিল ছোট ছোট ঢেউ। দীঘির পাড়েই দেখা গেল মণীশকে। বাইনাকুলারে চোখ রেখে কি যেন দেখছিল মনোযোগ দিয়ে। মণীশের পরণে রাত্রির পোষাক। সাদা পাজামা আর সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবী। ওর শরীরের অনাবৃত অংশে বলিষ্ঠ শরীর উঁকি মারছিল। শ্রীলা আস্তে আস্তে ওর দিকে এগিয়ে গেল। পিছনে মৃদু পদধ্বনি শুনে ওর দিকে না তাকিয়ে খানিক চাপা গলায় বলল হিস্-স্—। আস্তে। এখনি উড়ে যাবে।

উড়ে যাবে? কারা? শ্রীলা অবাক হল। মণীশের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল এক ঝাঁক পাখী শান্ত ভাবে মাঝ দীঘিতে বসে আছে।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল শ্রীলা। মণীশ বাইনাকুলারটা থেকে চোখ ফেরাল না। শেষপর্য্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করে শ্রীলাই বলল ওগুলো কি পাখী?

শ্রীলার গলার আওয়াজ পেয়ে বাইনাকুলার থেকে চোখ নামিয়ে সোৎসাহে মণীশ বলল ওগুলোর শীতের পাখী। কবিত্ব করে বলতে পারেন উত্তরের বিহঙ্গ। হিমালয় অঞ্চল থেকে আসে। ম্যালার্ড ওদের নাম। কখনও কখনও পীনটেলও আসে। একবার সাই-বেরিয়ান গীজ দেখেছিলাম।

সাইবেরিয়ান গীজ। এত দূরে? শ্রীলার চোখে আবার বিস্ময়। পুরুলিয়ার একটি অখ্যাত গ্রাম এবং সাইবেরিয়া। মাঝখানে দূরত্ব কত?

মণীশ বলল হ্যাঁ, হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আসে ওরা। গন্তব্য চিল্কা হ্রদ। এসব জায়গায় ওদের ডানার বিশ্রাম। আর কি দারুণ ওদের স্মৃতি দেখুন, একটুও পথ ভুল করে না। একই পথ ধরে প্রতিবছর উড়ে যায়।

এই দীঘিতে কতদিন থাকে?

ঠিক নেই। হয়ত কালই উড়ে যাবে। পথে যেতে যেতে নেমে পড়ে। ক্লান্ত পাখা বিশ্রাম নেয়। কখনও কখনও ডিম পাড়ে। তখন বাচ্চাগুলো একটু বড় না হলে দীঘি ছেড়ে যায় না।

আশ্চর্য্য।

সত্যিই। ভাবতে অবাক লাগে। সাইবেরিয়ার তুষার উপত্যকা থেকে হিমালয় পার হয়ে এখানে আসে। শীত শেষ হলে আবার ফিরে যায়। এরা আমাদের দেশের অতিথি পাখী।

বাইনাকুলারটা কাঁধে ঝুলিয়ে পাস দিয়ে হাঁটে মণীশ আর শ্রীলা। চলুন, ওই পাথরটার ওপর বসি।

পাথরটার এক কোণে খানিকটা রোদ্দুর এসে পড়েছিল। সেখানে বসল ওরা।

ওই পাখীগুলোর মত যদি হতে পারতাম। স্বপ্নাতুর কণ্ঠে মণীশ বলে। ছেলেবেলায় কতবার স্বপ্ন দেখেছি। আমি যেন পাখী হয়ে গেছি। উড়ে চলেছি কত দেশের ওপর দিয়ে কত সমুদ্র, পাহাড়,

মরুভূমি পার হয়ে, কত বন উপত্যকা, অতিক্রম করে ভেসে চলেছি। সে ভেসে চলবার বুঝি শেষ নেই।

শ্রীলা স্মিত হেসে বলল আপনি বুঝি কবিতা লেখেন।

না। আমি কবিতা খুঁজি। জীবনের কবিতা।

আমি ভেবেছিলাম বুঝি লেখেন, শ্রীলার কথায় যেন একটু তামাসার আভাস দিল। নিছক তামাসাই। মণীশকে আঘাত দেবার জন্য বলেনি তবুও মনে হল মণীশ আহত হয়েছে।

মণীশ বলল আমি সব সময় গুছিয়ে কথা বলতে পারি না তাই মনের মধ্যে যা আসে বলে ফেলি। আমাকে লোকে পাগল ভাবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনাকে যা বল্লাম তা আমার মনের কথা। কিন্তু কেউ আমাকে বোঝে না। বুঝতে চায় না। আমি, আমি অত্যন্ত—

কি? বলুন, থামলেন কেন শ্রীলার কণ্ঠে ব্যগ্রতা।

অত্যন্ত ব্যথা পাই। মণীশ বলল।

শ্রীলা সঙ্কোচের সঙ্গে বলল না বুঝে আঘাত দিয়েছি। ক্ষমা করুন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার কথা শুনতে আমার বেশ ভাল লাগছে।

মণীশ বলল আমি ঠিক সামাজিকতা মেনে চলতে পারি না। অনেকে আমায় নিন্দে করে। কিন্তু আমি পারি না। কোনদিন এভাবে চলতে শিখিনি, বলতে শিখিনি। চিরদিন নিজের মত কথা বলেছি। তাই আমার মত ছন্নছাড়ার স্থান হয়ত আধুনিক সমাজে নেই। এদের সমাজে আমি নিতান্তই ব্রাত্য। তাছাড়া—

তাছাড়া কি?

তাছাড়া আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের জীবন যাত্রা বোধ হয় অত্যন্ত যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে। জীবনটা বিজনেস ফার্ম নয় যে সব কিছু হিসেব করে করতে হবে। হাসি কান্না, মান অভিমান সব যেন দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করা। এর চেয়ে একটু বেশি বা কম

হলে জমা খরচের খাতায় অঙ্কের হিসেব মিলবে না। দুই আর দুই এ চার হবে না কিছুতেই, হয় পাঁচ, নয় তিন।

কিন্তু এর প্রয়োজন কি একেবারেই নেই? শ্রীলা শুধোল।

অবশ্যই আছে। সময় বিশেষে ফর্মাল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু জীবনটা ফর্মালিটির বাঁধনে বেঁধে রাখলে উপলব্ধির আনন্দ কোথায়? আনন্দ অসীম। কিন্তু আমরা সেই আনন্দেরও মাত্রা বেঁধে দিয়েছি। সেখানে আমার ওপরও আর একটা কঠিন আমি আছে। যে আমাকে সব আনন্দ আস্বাদ করতে দেয় না, সব সুখকে উপলব্ধি করতে দেয় না। তার চোখরাঙ্গানী আর অনুশাসনে আমি সর্বদাই সন্ত্রস্ত। এই দ্বৈত সত্ত্বার সংঘাতে আজকার সমাজ জীবন বিপর্যস্ত। আনন্দ অবসিত। সুখ বিরল।

মণীশের সব কথা শ্রীলা বোঝে না। মণীশের কথাগুলো শ্রীলার অন্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

মণীশ আবার বলে, মানুষ যত আত্ম সচেতন হচ্ছে, উপলব্ধি, চেতনা ও জ্ঞান যত গভীর হচ্ছে ততই সেই দ্বিতীয় আমির কাছে হেরে যাচ্ছে। আর আমার বিশ্বাস, আধুনিক সভ্যতায় এটাই মানুষের সব চেয়ে বড় অভিশাপ। মনীশের কথাগুলো শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার ওপর এত বিরাগ কেন মণীশের?

ইংরেজরা শুনেছি আরও বেশি ফর্মাল। আপনি এতগুলো দিন তাদের মাঝে কাটালেন কি করে? শ্রীলা জিজ্ঞেস করল।

ইংরেজরা ফর্মাল সন্দেহ নেই। ওদের সমাজ ব্যবস্থায় এটা অপরিহার্য। আমরা সমাজ সংস্কারের দিকে নজর দিইনি। ব্যক্তি সংস্কারের চেষ্টা করেছি প্রাণপণ। দুঃখ এখানেই। আর কেমন করে কাটালাম জানতে চাইছেন? যেমন করে এখানে দিন কাটাচ্ছি। অর্থাৎ কাজের সময় বাদ দিয়ে বাকী সময় ঘুরে বেড়িয়ে। ওদের দেশেও আমার মত ছন্নছাড়ার অভাব নেই। ওদের মধ্যে অনেক ইণ্টাম্ন্যাশনাল ছন্নছাড়া আছে যারা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ায়।

প্রত্যূষের রৌদ্রে ঝলমলিয়ে উঠল সামনের গ্রামটা। এতক্ষণ কুয়াশার অস্পষ্টতায় লুকিয়েছিল। লাউমাচা, সব্জির ক্ষেত আর ঈষৎ সবুজ কলাগাছগুলোর লাবণ্য যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঝিরঝির বাতাসে ধানের ক্ষেতে কাঁপন লাগে। এই ভর সকালে কোথায় যেন রাখাল ছেলে মন মাতানো ঝুমুর গাইছে। কেয়ার পাতায় শিহরণ।

চলুন এবার ওঠা যাক।

ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে হাঁটতে লাগল দুজন। কাস্তে হাতে একজন চাষী আসছিল। আল থেকে নেমে দাঁড়াল। জোড় হাতে সবিনয়ে নমস্কার করল মণীশকে, তারপর শুধোল, এত ভোরে কুথাকে গেছলেন গো সাহেব ?

মণীশ হেসে বলল, রাণী সায়রে শীতের পাখী এসেছে, তাই দেখতে গিয়েছিলাম। তা তোমার নাতি কেমন আছে ?

ওর মুখটা অত্যন্ত করুণ মনে হল। ভালই আছে সাহেব। তবে বড় কান্নাকাটি করে।

ও ঠিক হয়ে যাবে। তারপর যখন ভাল হয়ে আসবে তখন দেখবে তোমাদের মতই সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেছে ও। তখন যেন বাছ-বিচার করো না।

মণীশের আশ্বাসেও ওকে উৎফুল্ল মনে হল না।

বাছ-বিচার কি আর আমি কইরব সাহেব। হামার লাতি বটেন। তবে গাঁয়ের লোকগুলান বড় বদ। উয়ারা মানবেক নাই। আমাকে এক ঘর্যা করে দিবেক।

সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি ওদের বলে দেব'খন। তবে তুমি মাঝে মাঝে হাসপাতালে গিয়ে ওকে দেখে এসো, বুঝলে ?

ঘাড় নাড়ে লোকটা। তারপর আলের পথে নেমে যায়। মণীশ ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর বললে, আশ্চর্য। অথচ

আমরা সারমন দিই, লেপ্রসি ইজ্‌ নট এ কার্স অব্‌ গড্‌। কুষ্ঠ ভগবানের অভিশাপ নয়।

অভিশাপ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তো নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ। কিন্তু এই দুর্ভাগ্য স্বোপার্জিত নয়। এর জন্য সে নিজে দায়ী নয় নিশ্চয়ই। ওর ছেলের কুষ্ঠ হয়েছে, আমি লেপার এ্যাসাইলামের সুপারিন্টেডেণ্টকে চিঠি লিখে দিয়েছি। ছেলেটা হয়ত ভাল হয়ে আসবে, কিন্তু তারপর ?

তারপর কি ?

ওর দেহের অসুখ সেরে যাবে। কিন্তু যে মুহূর্তে ও গাঁয়ে ফিরবে, তারপর থেকে গাঁয়ের মানুষদের ঘৃণা আর অবজ্ঞায় সুরু হবে ওর মনের অসুখ। আর সে অসুখ কোনদিনই সারবে না।

আপনি এইসব ভাবেন কেন ?

ভাবি না। এইসব এলোমেলো চিন্তাগুলো সারাক্ষণ জট পাকায় আমার মাথায়. তারপর অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে হেসে মণীশ বলল, আর একটা মজার কথা জানেন। বাইরের লোকের ধারণা পুরুলিয়ার ঘরে ঘরে কুষ্ঠ। তারা পুরুলিয়ায় আসতেও ভয় করে।

শ্রীলা সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, এই ধারণা কিন্তু আমারও ছিল।

এ ধারণাটা অত্যন্ত ভ্রান্ত। কোন একটি রোগ কোন বিশেষ প্রদেশের নিজস্ব হতে পারে না। এখানে একটা লেপার এ্যসাইলাম আছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এটাই ছিল এশিয়ার বৃহত্তম কুষ্ঠ নিবাস। গাঁয়ের মানুষ চিকিৎসার জন্য আসে। অনেক সময় ভাল হয়। ফিরে যায় গাঁয়ে। যারা ভাল হয় না, তারা আর গাঁয়ে ফেরে না। ভিক্ষে করে দিন কাটায়। এদেরই দেখা যায় পথে ঘাটে। আসলে কি জানেন, কুষ্ঠ রোগের রেফারেন্স রামায়ণ-মহাভারতেও পাবেন, পাবেন প্রাচীন গ্রন্থ শুশ্রুত সংহিতায় বা ঐতরেয় পুরাণেও এবং আবার যেশাস ক্রাইস্টের যুগনিয়ে লেখা বেনহার-এর মধ্যেও। কুষ্ঠ একটি প্রাচীনতম রোগ। এবং অল্প

বিস্তর সব জায়গাতেই আছে, পুরুলিয়া বেচারা কি অপরাধ করল ?

মণীশের কথা বলার ঢং-এ শ্রীলা হেসে উঠল। ওরা বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল চন্দনা। ওদের দেখে চোখ বড় বড় করে বলল, মণিকাকু, কোথায় গিয়েছিলে তোমরা ? সবাই যে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। একটু বলেও তো যেতে হয় ?

চন্দনাকে কোলে তুলে নিয়ে মণীশ বলল, কিন্তু তুমি তো জানো, আমি রোজ দিনই ভোরে বেরিয়ে যাই।

মণীশের চুলে বিলি কাটতে কাটতে চন্দনা বলল, তা না হয় যাও, কিন্তু নতুন মানুষটাকে নিয়ে গেলে সে কথা তো বলে যেতে হয় বাপু।

অন্যায় হয়েছে। মণীশ ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল। তারপর চন্দনাকে শ্রীলার কোলে দিয়ে ল্যাবরেটারীর দিকে গেল। অনেক কাজ বাকী আছে।

শ্রীলার কোলে চড়ে যেতে যেতে চন্দনা বলল, মা কিন্তু আজ তোমাকে খুব বকবে নতুন মাসী।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, তুমি কিন্তু তখন কোন কথা বল না। মা তাহলে কিন্তু দারুণ চটে যায়।

তাহলে তো ভয়ের কথা।

না মা, ভয়ের কিছু নেই। চন্দনা আশ্বাস দেয়। তুমি শুধু চুপ করে মায়ের বকুনী শুনবে। বাপীও তাই করে।

শ্রীলা জোরে হেসে উঠল। পরিতোষ সেরেস্তা থেকেই চেঁচিয়ে বলল, চন্দনা, তুমি তোমার বাবার ট্রেড সিক্রেট মাসীর কাছে ফাঁস করে দিচ্ছ।

শ্রীলা আর একবার হাসল।

শ্রীলা চিঠি পড়ছিল। লণ্ডন থেকে চিঠি দিয়েছে ওর বড়দার বিদেশিনী বউ মার্গারিটা। লিখেছে, চিঠিতে সব জানলাম। তোমাকে সহানুভূতি জানাতে পারতাম। কিন্তু এর চেয়ে বড় দুঃখ আর নেই। অপরের সহানুভূতি হয়ত অন্য সময়ে দুঃখের ভার লাঘব করে। কিন্তু প্রেমে যে প্রবঞ্চিত তার কাছে সমবেদনা শুধু বেদনারই কারণ।

শ্রীলা চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে বাইরের দিকে তাকাল। এখন বাইরে একটা উষর নিস্তব্ধতা। কোথায় যেন একটা ঘুঘু একটানা ডেকে চলেছে। বাগানে চিকরিকাটা অ'লো ছায়ার কাঁপন। রাস্তায় কদাচিৎ দু-একটা গোরুর গাড়ী। সিভিল সার্জনের বাংলো থেকে মাঝে মাঝে হল্লা শোনা যাচ্ছে। ছেলেরা ক্রিকেট প্র্যাকটিশ করছে লনে।

বৌদি ভালই বাংলা শিখেছে। শ্রীলা ভাবল, অথচ—

প্রত্যেকের জীবনেই কোথাও না কোথাও দুঃখ রয়েছে। পরিপূর্ণ সুখ ও পরিপূর্ণ সার্থকতা অসম্ভব। শ্রীলা জানে তাদের বাড়ীতে বিদেশিনী বৌদির জন্য অবারিতদ্বার নয়। সেখানে মূর্তিমান বাধা ব্রজবিলাস নিজেই। সংঘাতটা সেখানে পিতাপুত্রের নয়। সংঘাত আদর্শের। সংঘাত মতবাদের। তবু বৌদি চেষ্টা করেছিলেন। ব্রজবিলাসকে চিঠি লিখেছিলেন তাদের ক্ষমা করবার জন্য। তাঁর স্নেহের ছায়ায় একটু আশ্রয় দেবার জন্য। কিন্তু ব্রজবিলাস সে চিঠির উত্তরে শুধু জানিয়েছিলেন, দুটো সমান্তরাল রেখা এক বিন্দুতে কোনদিনই মিলবে না। জ্যামিতি এই কথাই বলে। মিলতে গেলে একটা রেখার দিক পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাকে তোমার স্বামী ভাল করেই চেনে। আর আমার বিশ্বাস সেও তার মত পরিবর্তন করবে না, কারণ সে আমার ছেলে এবং তাহলে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাব আমি। কারণ—সংঘাতটা মত ও মতবাদের।

তারপর থেকে বৌদি নিয়মিত চিঠি দিয়ে এসেছেন ব্রজ-

বিলাসকে। ব্রজবিলাসও তার জবাব দিয়েছেন। সে পত্রের মধ্যে প্রশ্রয় ছিল, ছিল না আশ্বাস। স্নেহ ছিল, ছিল না করুণা।

সেই বৌদি, যার সঙ্গে শ্রীলার আজও প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি, যে দূরে থেকেও অনেক কাছের মানুষ। ওদের সুখ-দুঃখের শরিক। বিদেশিনীদের সম্পর্কে তো নানা কথাই শুনেছে শ্রীলা। ওরা ঘর বাঁধতে পারে না। ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা নিতান্তই আলগা। শ্রীলা ভাবে, মেয়েদের মন কি দেশে দেশে ভিন্ন। মার্গারিটা শ্রীলার সে ভুল ভেঙ্গে দিয়েছে।

দোতলার বারান্দায় গুণ গুণ ক'রে একটি গানের কলী ভাঁজতে ভাঁজতে সেই কথাই ভাবছিল শ্রীলা। হঠাৎ লক্ষ্য করল নীচে থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে মণীশ।

শ্রীলা শাড়ীটা বদলে নীচে নামল। হেসে বলল, কি ব্যাপার অমন করে ডাকছিলেন কেন?

অপ্রতিভ হ'য়ে মনীশ বলল, খুব অন্যায় হয়ে গেছে না? ওভাবে ডাকাটা ঠিক হয়নি। না বুঝে এমন সব কাণ্ড করে ফেলি মাঝে মাঝে।

না না অন্যায় কিছুই হয়নি। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো।

চলুন আজ আপনাকে নানারকমের শীতের পাখী দেখাব। মণীশ বলল।

এখানে শহরের বুকে একটা বিরাট দীঘি আছে। নাম সাহেব বাঁধ। শীতকালে নানান্ বিদেশী পাখীতে ভ'রে যায়।

আপনি পাখী চেনেন? জিগ্যেস করল শ্রীলা।

কিছু কিছু। কিন্তু আর দেরী করা চ'লবে না। এবার চলুন। তাড়া দেয় মণীশ। শীতের বিকেল। কাছাকাছি গাঁয়ের মেয়েরা সব্জির পসরা আর শালপাতা নিয়ে গিয়েছিল শহরের বাজারে। তারা ধীর পায়ে ফিরে আসছে। আধুনিক সভ্যতার ছায়া পড়েনি কোথাও। পরণে কস্তা পেড়ে শাড়ী। গায়ে হাল্কা দু একটা

রূপোর গয়না। চোখে সর্বদাই একটা বিস্ময় মাখানো দৃষ্টি। এরা কত সুখী। শ্রীলার অজান্তেই ওর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

কি হ'ল?

ভাবছি।

কি?

ভাবছি এরা কত সুখী।

কারা?

এই গ্রামের মেয়েরা। যারা সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও ঠোঁটের হাসিটি জীইয়ে রাখে। শুধু একটি পরিতৃপ্ত সংসার নিয়েই যাদের পৃথিবী।

সুখ কথাটা আপেক্ষিক। সুখ আমাদের কাছে দুর্লভ, কারণ আমরা আয়নায় সুখ খুঁজি। আমরা জানি পৃথিবীতে অনেক সুখ লুকিয়ে আছে যার সন্ধান আমাদের অজানা। সেই অজানা সুখের সন্ধানে আমরা প্রতিদিনের সুখকে হারিয়ে ফেলি। কিন্তু এত সুখের সন্ধান এরা জানে না। এরা জানে সুখ লুকিয়ে আছে সংসারের চার দেওয়ালের মধ্যে। সে সুখকে সকলে মিলে ভাগ করে নেয়। এদের জীবনে বঞ্চনা নেই, তাই আক্ষেপও নেই।

ওরা সার্কিট হাউস ছাড়িয়ে রাঘব পুরের রাস্তায় হাঁটছিল। পাশেই ওয়াটার ওয়ার্কস এবং অফিসারদের ফ্ল্যাট। আর একটু ছাড়িয়ে মেঠো পথ। দু পাশে জলা আর ধানের ক্ষেত। ক্ষেতের আলের ওপরে একটা বকের মত পাখী। ঘাড় উঁচু করে এক পা গুটিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর কয়েকটা জলাটার পাশে ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অত্যন্ত সন্তর্পণ পদক্ষেপ। শুচিবায়ু গ্রস্ত বিধবার মত।

বেশ মজা লাগল শ্রীলার। ওগুলো কি পাখী? শ্রীলা জিগ্যেস করল।

ওগুলোর নাম হোয়াইট স্টর্ক। সারস জাতীয় পাখী। বিদেশ থেকে এসেছে।

শ্রীলা চোখ কপালে তুলে বলল অতদূর থেকে উড়ে এসেছে ?

হ্যাঁ। কন্টিনেন্টের অনেক পাখীই শীতকালে ট্রপিক্যালএ আসে বাঁচার তাগিদে। ওদিকের প্রচণ্ড শীত সহ্য করার ক্ষমতা থাকে না বলে। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

শ্রীলা মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে। পাখনার প্রান্তে কালোর ছোপ ঠোঁটটা লাল। ওই পাখীটা বোধ হয় এদের নেতা। কেমন রাজাধিরাজের মত দাঁড়িয়ে আছে।

আচ্ছা এরা আমাদের দেশে বাসা বাঁধে না ?

না এরা মাইগ্রেটরী। এদের সম্বন্ধে একটা মজার বিশ্বাস ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রচলিত আছে জানেন। এরা সাধারণতঃ কারখানার চিমনী বা টাওয়ার ইত্যাদির ওপরে বাসা বাঁধে। যদি কারো বাড়ীর পাশে বাসা বাঁধে তাহলে সেই বাড়ীতে একটি নতুন আগন্তুকের সম্ভাবনা সূচনা করে। অর্থাৎ একটি শিশুর জন্ম।

শ্রীলা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

উৎসাহিত হয়ে মণীশ বলল, আরও বিচিত্র কি জানেন ? ব্রিডিং সীজন এ পক্ষীনী নিজেকে মোহিনী বেশে সাজায়। তখন ওদের মাথার ওপরে একরকমের ঝুঁটী বেরোয়। যাকে বলে ব্রিডিং প্লিউমেজ।

জলা পার হ'য়ে ওরা দেশবন্ধু রোড দিয়ে হাটছিল। শীতের তড়িঘড়ি সূর্য্য সবে অস্ত গেছে। আলো ফুরোয়নি এখনও। সাহেব বাঁধের মাটীর ঢিপি দুটো, যাকে সবাই আদর করে দ্বীপ বলে। সেগুলো ধূসর ছায়ায় এর মধ্যেই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। হাঁটতে বেশ ভাল লাগছিল শ্রীলার। শ্রীলার মনে হচ্ছিল এমনি একটি পরিশীলিত রুচির মানুষের সঙ্গ সে বহুদিন পায়নি। মণীশকে বেশ ভাল লাগছিল শ্রীলার। দীর্ঘদিন ধ'রে মণীশ ছিল একটি কিংবদন্তীর

মানুষ। ওর খেয়ালীপনা ও বোহেমিয়ানার অনেক গল্প শুনেছিল ঊর্মিলার কাছে।

মণীশ সম্বন্ধে কতকগুলো কৌতূহল আছে শ্রীলার। কোন এক সময়ে জিগ্যেস করবে শ্রীলা ভাবল। সাহেব বাঁধের পূবদিক ধরে হাঁটছিল ওরা। এ পাশে অতীত দিনের বিখ্যাত ও চিত্তবান মানুষদের বিশ্রাম নিবাস। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ডব্লু. সি. ব্যানার্জি নাড়া জোলের মহারাজাদের বাড়ী। এদিকেই উইম্যানস কলেজ, রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছ। শাল, পিয়াল, আমলকী অনেকটা এভিনিউ মত। গাছের মাথায় কিচির মিচির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল শ্রীলা। একসঙ্গে ওপর দিকে তাকাল।

মণীশ বলল প্রচণ্ড শীতের পাখী। নাম ক্রেস্টেড্ কাক্কু। ওদের দেশের কোকিল। কিন্তু এদের মেল আর ফিমেলদের মধ্যে ডাকের তারতম্য আছে।. মেল বার্ডদের ডাক পিউ পিউ। ফিমেলদের ডাক পী পী। মাথায় কালো ঝুঁটী। কালো আর খয়েরীতে মেশানো ডানা। এদের মৌসুমী পাখী বলা যায়। অথবা মৌসুমের অগ্রদূত। এ্যারাবিয়ান কোষ্টে এরা পৌছাবার ছয়ঘণ্টার মধ্যেই মনসুনের সূচনা হয়।

টাওয়ার ভিলা বাঁয়ে রেখে শ্রীলা আর মণীশ সাহেব বাঁধের কিনারে এসে দাঁড়াল। দীঘির বুকে অজস্র পাখী। ওরা দুজনে ঘাসের ওপরে বসল। মণীশ বলল যে পাখীগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে, ওগুলোর নাম ম্যালার্ড। দেখতে পাতি হাঁসের মত। মানুষকে ওরা এখন ভয় করতে শিখেছে। আগে স্বচ্ছন্দে ঘাটের কাছে ঘুরে বেড়াত। এখন ওরা বুঝেছে পুকুরের ধারে ভীড় ক'রে থাকা মানুষের দল ওদের বন্ধু নয়, শত্রু। ওদের ডানার রং খানিকটা সবুজ ঘেঁষা। আশ্চর্য্য এদের ক্যামোফ্লেজ করবার শক্তি। লুকিয়ে থাকলে এ্যালসেসিয়ান কুকুরেরও সাধ্য নেই খুঁজে বার করে।

পাখীর পৃথিবী সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই শ্রীলার। তাছাড়া কলকাতার আকাশে এত পাখীও নেই। শ্রীলার মনে হ'ল শহরকে বুঝি ওরা ভয় করে। অথচ মাঠে ঘাটে গ্রামে গঞ্জে ওদের অবাধ বিচরণ। শহরের মানুষের মধ্যে যত সন্দিগ্ধতা গ্রামের মানুষদের মধ্যে বোধ হয় ততখানি নেই। শ্রীলা ভাবল। পরক্ষণেই শ্রীলার মনে হ'ল বোধ হয় নিখিলেশের বঞ্চনাই ওকে এমনি শহর বিমুখ করে তুলেছে। এক সময় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল শ্রীলা। কি যেন বলতে গিয়ে থমকে মণীশ বলল তখন থেকে শুধু আমিই বক্‌বক্‌ করছি, আপনি কিছুই শুনছেন না।

শ্রীলা সপ্রতিভ হ'য়ে বলল না না আমি শুনছি, আপনি বলুন। তারপর মণীশের আগ্রহকে উদ্দীপিত করবার জন্য বলব আচ্ছা ওই যে ঘাটের ধারে টুক টুক করে ডুব দিচ্ছে, ওই পাখীগুলোর নাম কি?

মণীশ একটু নিরীক্ষণ করে বলল ওইগুলোই তো পীনটেল। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন সূক্ষ্মাগ্র ল্যাজই ওদের বৈশিষ্ট। ওরা যখন টুক টুক করে জলে ডুব দেয় তখন মনে হয় একটা বারের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যালান্সের খেলা দেখাচ্ছে। ওরা কখনও দলছাড়া হয় না। তাই ওদের দেখতে বেশ মজা লাগে।

হঠাৎ হাততালী দিয়ে উঠল শ্রীলা। চমকে পাখীগুলো উড়ে গিয়ে খানিক দূরে গিয়ে বসল তারপর বার বার ঘাড় ফিরিয়ে চকিত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল চারদিকে।

মণীশ বলল চলুন এবার ফেরা যাক। ওরা পাকা রাস্তায় পৌঁছাবার আগেই সন্ধ্যা ঘনাল। সাহেব বাঁধের পুবদিকের পাড়ে সারি সারি বাতি দেখে শ্রীলা জিগ্যেস করল ওগুলো কি?

ওগুলো বর্শেলদের বাতি। ওরা বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরছে।

শ্রীলা একটু ক্লান্ত বোধ করছিল। ওরা ধীর পায়ে পথ হাঁটছিল। অর্জুন আর আমলকীর শাখায় অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। একটি একটি করে অনেক তারা ফুটেছে আকাশে। হিমেল বাতাস ভেসে

আসছে, তার সঙ্গে নাম না জানা ফুলের সুবাস। রাঁচী প্যাসেঞ্জার হুইশেল দিয়ে পার হয়ে গেল। পথ নিঃঝুম।

শ্রীলা কুণ্ঠিত স্বরে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না তো?

কি কথা।

আপনার সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকে নানা রকম কৌতুহল ছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর অবসান হয়েছে, কিন্তু একটা কৌতুহল এখনও আছে।

সেটা কি?

আপনি তো শুনেছি ভাল ছাত্র ছিলেন। সার্জারীতে মেডিক্যাল কলেজে ফার্ষ্ট হয়েছিলেন, তাহলে এফ. আর. সি. এস পড়তে গিয়ে পরীক্ষার ঠিক আগেই দেশে ফিরে এলেন কেন?

মনীশ আনমনে বলল, খেয়াল।

না, খেয়াল নয়। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল।

মনীশ ঘাড় ফিরিয়ে শ্রীলার দিকে তাকাল, তারপর বলল, আপনি হয়ত জানেন, পরীক্ষার আগে আমি গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তাই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় দেশে ফিরে আসি। তারপর নানান ঝামেলায় আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

শুধু কি তাই? শ্রীলার কণ্ঠে আন্তরিকতা মেশানো অবিশ্বাস।

শুধু তাই নয়। মনীশ বলল, এর মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল। কিন্তু এসব জিজ্ঞেস করে কেন আমাকে বিপন্ন করছেন। সে সব কথা আমার নিজের। একান্তই নিজের।

শ্রীলা বিব্রত হয়ে বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না।

মনীশ কোন জবাব দিল না। ওর দৃষ্টি যেন অন্ধকার ভেদ করে কোন সুদূরে নিবদ্ধ। শ্রীলা দু পাশের গাছে জোনাকির মেলা দেখতে দেখতে পথ হাঁটতে লাগল।

উর্মিলা পরিতোষের সঙ্গে গল্প করছিল। কাল যেন কিসের একটা ছুটি আছে। কোর্ট বন্ধ। পরিতোষের কাজের চাপ নেই বড় একটা। গায়ে শাল জড়িয়ে প্রথম শীতের আমেজটা উপভোগ করছিল ও। উর্মিলা পশম দিয়ে চন্দনার জন্য একটা সোয়েটার বুনছিল। পশমের গোলাটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল।

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলে তখন পরিতোষ বলল, সেই যে দুপুর বেলায় মনীশ ঘরে এল।

উর্মিলা কাঁটায় একটা ফাঁস পরিয়ে আধবোনা সোয়েটারটা সরিয়ে রাখল, তারপর বলল, হ্যাঁ আমি শ্রীলার কথা বলছিলাম।

কেন, আবার কি হল শ্রীলার?

হয়নি কিছুই। সেই ব্যাপারটার পর থেকে ভারী মুষড়ে পড়েছিল ও। এখানে আসবার পর থেকে লক্ষ্য করছি, ওর স্ফুর্তি আর উৎসাহ ধীরে ধীরে ফিরে আসছে?

এ তো ভাল কথা। তোমার বাবাকে লিখে দাও, তিনি খুশি হবেন জেনে।

হ্যাঁ, লিখব। আর কদিন থাক।

কেন, আর কদিনের মধ্যে কি নতুন কিছু ঘটতে পারে?

কিছুই বলা যায় না। আমি ওদের মতিগতি লক্ষ্য করছি।

ওদের মানে?

শ্রীলা আর মনীশ। ওদের অন্তরঙ্গতা খুব গভীর হবে। অবশ্য এর থেকে কিছুই অনুমান করা যায় না, তবে—

পরিতোষ বাধা দিয়ে বলল, তোমার কথাগুলো বড্ড হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে। একটু সরল করে বল।

উর্মিলা ওর বক্তব্য স্পষ্ট করবার জন্য পরিতোষের পাশে ঘন হয়ে বসল।

শ্রীলা করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সহসা নিজের নাম শুনে থমকে দাঁড়াল।

উর্মিলা তখন পরিতোষকে বলছিল ওদের দুজনার মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে ওরা পরস্পরের মধ্যে একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে ওরা দুজনেই আবার নতুন করে বাঁচবে। কারণ দুজনেরই একটা অবলম্বন দরকার।

উর্মিলার কথগুলো দিনের আলোর মত পরিস্কার। শ্রীলা এবং মনীশ। একথা তো আগে ভাবেনি শ্রীলা। নিখিলেশের জায়গায় মনীশ? আবার নতুন করে ভাবতে হবে। সেই গানের কলিটা আবার গুনগুনিয়ে উঠল শ্রীলার মনের মধ্যে। ঘরেতে ভ্রমর এল।

পরদিন বিকেল বেলায় আবার দেখা হল মনীশের সঙ্গে। মনীশ একটা কল সেরে সাইকেলে করে ফিরছিল। গেটের পাশে ওকে উচ্ছুসিত অভ্যর্থনা জানাল শ্রীলা—আপনার জন্যই প্রতীক্ষা করছি।

মনীশ মৃদু হেসে সাইকেল থেকে নামল। কাঁসাই নদীর ওপারে একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। নদীর ধারে সমগ্র সব্জির ক্ষেত। মটর স্যুঁটি, শশা, তরমুজ আরও কত কি। সবুজ শুধু সবুজ। তাই ভাবছিলাম—

কি ভাবছিলেন?

না; থাক। আপনি হয়ত কিছু মনে করছেন।

আপনি সব কিছুতে এত সঙ্কোচ বোধ করেন কেন? কথায় কথায় রাগ করব, আমি কি সেই রকম?

মনীশ বলল ওই চোখ জুড়ানো সবুজের মেলা দেখতে দেখতে শুধু আপনার কথা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই সময় যদি আপনি পাশে থাকতেন, তাহলে কত ভালো লাগত।

কথা কটির মধ্যে মনীশের নিসঙ্গতাটুকুই স্পষ্ট হল। এবং অন্তরঙ্গতাও।

আপনার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য সুন্দর কবিমন আছে। তাই আপনি যা দেখেন তাই সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। এমনি মন যদি আমার থাকত, তাহলে অনেক দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেতাম।

চলুন না কোথাও বেড়িয়ে আসি।

এই সন্ধ্যে বেলায় ?

মনীশ বলল না, থাক, কিছু মনে করবেন না আপনি।

না। মনে করার কিছু নেই। আপনার সঙ্গে বেড়াতে যেতে কোন দ্বিধা নেই আমার। কিন্তু আপনি পরিশ্রান্ত। তাই।

অসীম উৎসাহের সঙ্গে মনীশ বলল মোটেই না। আমি এক্ষুনি আসছি। আপনি বরং এই গেটের পাশেই অপেক্ষা করুন।

সাইকেলটা ল্যাবরেটারীর বারান্দায় ঠেসিয়ে রেখে প্রায় লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকল মনীশ।

সন্ধ্যে ঘনিয়েছে শহরে। বাতিগুলো জোনাকির মত জ্বলছে। ওয়াটার ওয়ার্কসএর নিওনের আলোয় খানিকটা জায়গা উদ্ভাসিত। রিজার্ভার দুটো জ্ঞানবৃদ্ধ অশ্বত্থের মত দাঁড়িয়ে আছে। গেটের মাধবীলতার পাশে দাঁড়িয়েছিল শ্রীলা।

কোর্ট থেকে ফেরার সময় শ্রীলাকে গেটের পাশে একা দেখে বিস্মিত হল পরিতোষ।

কার প্রতীক্ষায়, আমার বুঝি ?

শ্রীলা হেসে বলল আপনার প্রতীক্ষায় যাঁর থাকার কথা তিনি রান্না ঘরে রাত্রির আহারের আয়োজনে ব্যস্ত। অতএব—

কিন্তু এখন তুমি কার প্রতীক্ষায় তা জানতে পারি কি ?

ঠিক সেই সময়েই ভেতর থেকে মনীশ বেরিয়ে এল।

পরিতোষ শ্রীলার দিকে তাকাল। শ্রীলা পরিতোষের দিকে। তারপর দুজনেই হেসে উঠল।

চলুন। আজ রাঁচী রোড ধরে হাঁটি।

নীরবে পথ হাঁটছিল শ্রীলা। শ্রীলা গতকাল উর্মীলা আর

পরিতোষের আলোচনার কথা ভাবছিল। ওরা হয়ত আরও অনেক কিছু আলোচনা করছিল। শুধু মাত্র কয়েকটা টুকরো কথা কানে এসেছে শ্রীলার। মনীশও কি তাই ভাবছে? আর শ্রীলা? মনের মধ্যে অনুসন্ধান করে শ্রীলা।

নীরবতা ভঙ্গ করে মনীশ বলল, একি আপনি চুপচাপ পথ হাঁটছেন। গল্প করুন। চুপচাপ বেড়াতে কি ভালো লাগে?

শ্রীলা বলল আপনি বলুন, আমি শুনি।

জানেন একবার আমি আর কয়েকজন বন্ধু রাঁচী গিয়েছিলাম সাইকেলে। প্রায় আশি মাইল রাস্তা।

শ্রীলা চোখ কপালে তুলল কষ্ট হয়নি?

হয়নি আবার। শেষের দিকে মনে হচ্ছিল কোমর বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। যন্ত্রের মত চালাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল পাগুলো বুঝি আমার নিজের নয়। যেন অনন্তকাল ধরে এই দুটো পা শুধু প্যাডেল চালিয়ে আসছে। তবে মজাও পেয়েছিলাম অনেক। পথের সব কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম হুডরু, জোনা আর দশম ফলশ-এ গিয়ে। কি মনোরম দৃশ্য। চোখ জুড়িয়ে যায়। আর কি আশ্চর্য্য, প্রত্যেকটি জায়গার ভিন্ন ভিন্ন রূপ যেন আপন মহিমায় ভাস্বর। হুডরুর ধ্যানগম্ভীর রূপের কাছে যেন জোনার প্রাণোচ্ছলা কিশোরী মেয়ের মত মনে হয় আবার দশম ফলস এ গিয়ে সেই প্রাণোচ্ছলা কিশোরীটি যেন যৌবন সমাগমে লাজুক লাবণ্যময়ী। জানেন আমি তখন কবিতা লিখতাম। মনীশ ছেলেমানুষের মত হাসল।

উত্তুরে বাতাসে কাঁপন লাগছিল সারা শরীরে। শ্রীলা ওর কালোর ওপরে সাদার বুটীদার শালটা ঘোমটার মত করে মাথায় জড়াল।

মনীশের ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর পরণে একটা ট্রাউজার গায়ে একটা পুলওভার।

মাঝে মাঝে বাস আর লরীর তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার একটা পাশ ধরে হাঁটছিল ওরা। মসৃণ পীচের রাস্তার দুপাশের জমিতে নরম ঘাসের আস্তরণ। তার নীচের জমিতে ধানের ক্ষেত, সব্জির বাগান। ঘাসের শীষে শীষে এরই মধ্যে শিশির জমেছে। বেশ খানিকটা পথ হেঁটে একটা পরিস্কার জায়গা দেখে ওরা বসল। শ্রীলার জন্য মাটিতে রুমালটা বিছিয়ে মনীশ বলল আমার কাছে ক্লোক নেই। না হ'লে ওয়াল্টার র‍্যালের মত তাই বিছিয়ে দিতাম।

শ্রীলা মুচকী হেসে বলল আপনার মধ্যে ইংলিশ শিভ্যালরীর লেশ মাত্র নেই। আপনি বাঙ্গালী। নিছক বাঙ্গালী। আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে দেশটা আগাগোড়া সহবৎ আর শিভ্যালরির বাঁধনে বাঁধা সেই দেশে আপনি একটা কাল কাটালেন কি করে ?

মনীশ বোধ হয় শীতের হাত থেকে রেহাই পাবা: জন্য দুহাত দিয়ে হাঁটু দুটো জড়িয়ে হাতের ওপর থুতনী রেখে বসেছিল। শ্রীলার কথা শুনে মুখ তুলে বলল সব দেশে সব সময়ই কিছু মানুষ থাকে যারা চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম। কিছুটা খাপছাড়া, কিছুটা বেহিসেবী। সে দেশের লোক হয়ত এই সব মানুষকে করুণা করে, কিন্তু ঘৃণা করে না। কারণ করুণার মধ্যে নিজেদের কিছুটা দুর্বলতা মেশানো থাকে কিন্তু কাউকে ঘৃণা করতে হলে প্রচণ্ড। ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। এমনি, দেশের ও বিদেশের করুণা নিয়েই আমাকে প্রবাসের দিনগুলো কাটাতে হয়েছে।

কারো কারো কথার সুরে মাঝে মাঝে এমন শূণ্যতার আভাস থাকে যার সঙ্গে নিজেকেও মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় তার এই বেদনাবোধের অংশীদার হতে। তার সুখ-দুঃখকে নিজের মত ভাবতে। হৃদয় দিয়ে তার হৃদয়কে অনুভব করতে। এবং সেই আবেগটা আসে প্রচণ্ড জলস্রোতের মত। সেই আবেগেই শ্রীলা বলল কিন্তু প্রবাস কি আপনাকে কিছুই দেয়নি ?

দিয়েছে অনেক কিছু, কিন্তু কেড়েও নিয়েছে অনেক কিছু।

এ কথা বলছেন কেন?

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় লণ্ডন শহরটার ইট মাটি কাঠ ও শুধু বিজনেস জানে। কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হবে। লণ্ডন আমাকে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে কিন্তু সে তো নিঃশুল্ক নয়। তার খাজনা মেটাতে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।

শ্রীলা অনুভব করল হৃদয়ের দিক দিয়ে দারুণ নিসঙ্গ মনীশ। কিন্তু লণ্ডনের সঙ্গে কোন সূত্রে গাঁথা আছে তার ইতিহাস? মনীশের সঙ্গে ওর নিজের একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য খুঁজে পেল শ্রীলা। ওরা দুজনাই নিঃস্ব। দুজনেই শূন্যতা বোধের শীকার। নিরাশার সমুদ্রে অসহায়ের মত আশ্রয় খুঁজছে। মনীশের দৃষ্টি সুদূরের দিকে। যেন হারিয়ে গেছে ওর দৃষ্টি, আকাশ ছাড়িয়ে গ্রহ তারা ছড়িয়ে আরও দূরে, অনেক দূরে।

মনীশ বলল এমনী উতলা বাতাস যখন জানালার পর্দা উড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে সব কিছু এলো মেলো করে দেয়। তখন আমার মনের মধ্যে জট পাকানো ভাবনা চিন্তাগুলোও যেন এলো মেলো হ'য়ে যায়। তখন আমি ভাবি। আমি ভাবি।

কি?

অবশ্যই একটি মেয়ের কথা। মনীশের অকপট বিবৃতি।

কে সে?

তার নাম ষ্টেলা, ষ্টেলা ব্রাউন। আইরীশ মেয়ে।

একটুক্ষণ উভয়েই নিশ্চুপ। শ্রীলা কথার মধ্যে ছেদ টানল না। শ্রীলা জানে এবার মনীশ সব কিছু বলবে। কথাগুলো ওর হৃদয়ের উৎসমুখ থেকে স্বতোৎসারিত নির্ঝরের মত বেরিয়ে আসবে কারণ আজ আকাশ বড় বেশী নীল, বাতাসে আজ পাহাড়ীয়া ফুলের মদির সুগন্ধ, রাত্রির অন্ধকার আজ বড় বেশী গভীর।

আমার সঙ্গেই সার্জারী পড়ত। ওর সোনালী চুলে যেন

মধ্যাহ্নের সূর্য্যালোক ঠিকরে পড়ত। নীল চোখে দক্ষিণ সমুদ্রের হাতছানি। কোপেন হোগেনের সাগর তীরের সেই নিসঙ্গ জল-কন্যাটির কথা আমার মনে পড়ত। আমি ওকে প্রায়ই সেকথা বলতাম। ও হাসত, কিন্তু আমি তো নিসঙ্গ নই। আমার পাশে তুমি রয়েছ। তোমাকে পেলে আমি পৃথিবীকে ভুলে যেতে পারি। সার্জারীর ক্লাশে আমি আর ও পার্টনার ছিলাম। কত দুরূহ অপারেশন দুজনে একসঙ্গে কনডাক্ট করেছি। মানব দেহের কিছুই তো অজানা ছিল না। হাসতে হাসতে এ্যাবডোমেণ ওপেন করেছি। পাঁজরের হাড় কেটে রোগীর হার্ট ম্যাসেজ করে দিয়েছি। কিন্তু তখন কি ছাই জানতাম যে হার্ট মানে হৃদয়, শুধু হৃৎপিণ্ড নয়। আর অপরেশন করলেই হৃদয়কে জানা যায় না। তবু আমরা ভালবেসেছিলাম। কাছে এসেছিলাম। ওর দেশেরই আর একটি ছেলে মেডিসিন পড়ত। নাম ছিল রবার্টসন। আমরা তিনজন একসঙ্গে বেড়াতাম। আমি, ষ্টেলা আর রবার্টসন। কখনও বা ছুটির দিনে, কখন ও ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে আমরা চলে যেতাম দূরে, ফক্সটোন গ্রামে, অথবা অন্য কোথাও, যেখানে নাগরিক জীবনের চিহ্ন নেই, যেখানে গমের ক্ষেতে বুড়ো চাষী মুখে পাইপ দিয়ে ট্রাক্টর চালাচ্ছে।

তামাকের ধোঁয়ায় গোঁফ জোড়াটা লাল। অজস্র বলী রেখাকীর্ণ মুখ। প্রজাপতির পাখনার মত রঙ্গীন গাউন পরে পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার মেয়েটি।

অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে ওর বাবাকে শুধিয়েছিল মেয়েটি হে পাপা, ইণ্ডিয়ান ?

আমরা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। তারপর তাদের খামারে গিয়েছিলাম। অজস্র পীচ ফল ভাগ করে খেয়ছিলাম দুজনে। মেয়েটি কফি দিয়েছিল। নিমন্ত্রন করেছিল আবার আসবার। ঈষৎ লজ্জার সঙ্গে বলেছিল, তোমাদের বিয়ের পর

এখানে হনিমুন করতে এসো। ওই যে নদীর ধারে ছোট্ট বাড়ীটা দেখছ, যেটার চারিদিকে অজস্র হলিহপ ফুলে ফুলে ভ'রে আছে, ওটা আমাদের। তোমরা এলে ওখানে তোমাদের থাকতে দেব।

কখনও বা টেমস নদীর ধারে অথবা রিজেণ্ট পার্কের নির্জন কোনায় ব'সে কাটাতাম। ও আমাকে ওর দেশের কথা ব'লত। আমার রক্তে দোলা লাগত। কখনও কখনও রবার্টসন আমাদের সঙ্গে থাকত। ভীরু ভীরু চাউনী। চেহারার মধ্যে একটা মেয়েলী কমনীয়তা। ষ্টেলা ওর চেয়ে বয়সে দু এক বছরের বড়। ষ্টেলা ওর সঙ্গে দিদির মতই ব্যবহার করত। শাসন করত, ধমক দিত।

লণ্ডন শহরে মাঝে মাঝেই প্রচণ্ড শীত পড়ত। তখন কোট ওভার কোট, কিছুতেই কুলোয় না। ইচ্ছে হয় সারাটা দিন ফায়ার প্লেসের ধারে ব'সে কাটিয়ে দিই। কিন্তু তবুও আমরা বেরিয়ে যেতাম। কখনও বা টাওয়ার ব্রীজে ব'সে থাকতাম। কখনও অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট ধরে লক্ষ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে পথের ধারে কোন মিল্কবারে ঢুকে স্যাণ্ডউইচ্ আর কফি খেতাম। রবার্টসন কাছে থাকলে আমরা সংযত হ'য়ে কথা বলতাম এবং যেদিন মনে হত অনেক কথা জমে গেছে অথচ রবার্টসন কাছে থাকার জন্য বলা যাচ্ছে না সেদিন এক অপূর্ব কৌশলে রবার্টসনকে সরিয়ে দিত ষ্টেলা। একি রবার্টসন, লণ্ডনের এই শীতে তুমি গলায় কম্ফর্টার দিয়ে আসনি? এ দেশটা কি তোমার ভিলেজ হোম পেয়েছো না কি? যাও গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে এসো।

রবার্টসন বিনা প্রতিবাদে উঠে যেত। কখনও ষ্টেলা বলত আরে রবার্টসন চোখ ছল ছল করছে কেন? নিশ্চয়ই তোমার শরীর খারাপ হয়েছে।

রবার্টসন ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করত, না না বেশ তো আছি।

ষ্টেলা ধমক দিত। মেডিসিনের ছাত্র হ'য়েও নিজের শরীর

খারাপটুকু বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই। যাও বাড়ী গিয়ে শুয়ে থাকোগে।

ষ্টেলার কথা অমান্য করার সাহস ছিল না রবার্টসনের।

আশ্চর্য্য একটা মেয়েলী ভীরুতা ছিল রবার্টসনের মধ্যে। ষ্টেলাকে ও ঠিক ভয় করত না। কথা না শুনলে হয়ত ষ্টেলা আহত হবে তাই ও কখনও ষ্টেলার অবাধ্য হত না। রবার্ট'সনের এই দুর্বলতাটুকুর সুযোগ নিতাম আমরা আসলে ভীরু ভীরু চেহারা আর লাজুক চাউনীর এই ছেলেটাকে আমরা অনুকম্পা করতাম। স্নেহ করতাম। ষ্টেলা আর আমি, দুজনেই। প্রতিদিনই আমরা রবার্ট'সনকে এ ভাবে পরিহার করবার চেষ্টা করতাম ঠিক তা নয়। যেদিন আমরা কাছাকাছি থাকতে চাইতাম, সেদিন কোন না কোন ছুতো করে রবাটসনকে বাড়ী পাঠিয়ে দিত ষ্টেলা। আমরা ভাবতাম রবার্টসন কিছুই বুঝত না। আমাদের এই লুকিয়ে লুকিয়ে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা বা ওকে এড়িয়ে চলা, এটাকে রবার্টসন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সব আঘাত যেন এক হয়ে একদিন ফিরে এল যেদিন রবার্টসন ওর পৌরুষের দাবী নিয়ে সেই করুণার পাত্র আমার দিকে এগিয়ে দিল সেদিন আমার সব কিছু সেই পাত্রে উজাড় না ক'রে আমার উপায় ছিল না।

সেদিন আমি আর ষ্টেলা নির্জনে অনেকক্ষণ গল্প ক'রেছিলাম। বিলেতে একটা এনগেজমেণ্ট ঘোষণা করার একটা প্রথা প্রচলিত আছে। তখন আমরা পরস্পরের কাছে সমর্পিত। শুধু মাত্র এনগেজমেণ্ট ঘোষণা ক'রে একটি শুভ দিন দেখে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের কাছে যাওয়া। এনগেজমেণ্টের আগে মা বাবার মত নেওয়াটা সৌজন্য কিন্তু আবশ্যকীয় নয়।

সেই সম্বন্ধেই বলছিল ষ্টেলা। আমার বাবা অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের লোক। ফ্যাক্টরীতে কাজ করেন আর রাতদিন ভডকার

নেশায় চুর হ'য়ে থাকেন। তিনি ইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করতে কিছুতেই মত দেবেন না।

আমি ষ্টেলার গলা জড়িয়ে বলেছিলাম তাহলে উপায়?

ষ্টেলা ভাষা দিয়ে ব'লেছিল সব ঠিক হ'য়ে যাব। আমার মাকে তো দেখনি। কতো ভালো যে তিনি ব'লে বোঝাতে পারব না। থিয়েটারে পিয়ানো বাজান। তিনি নিশ্চয়ই মত দেবেন। তাছাড়া কথাটা রবার্টসনের মারফত বাবাকে বলব। বাবা ওকে দারুন ভালবাসে।

আমি ওর অনামিকায় এনগেজমেন্ট রিংটা পরিয়ে দিলাম।

পরদিন রবাটসনের সঙ্গে দেখা হ'ল। ওর মুখ গম্ভীর। বলল তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে! সন্ধ্যে বেলায় মন্টিকার্লো কাফেতে এসো।

সন্ধ্যে বেলায় ও. টি. তে ষ্টেলা কি যেন একটা জরুরী অপারেশনে ব্যস্ত ছিল। আমি একাই গেলাম মন্টিকার্লো কাফেতে। আমি আর রবার্টসন মুখোমুখি বসলাম। দুকাপ কফি অর্ডার দিল রবার্টসন।

কিছুক্ষণ দুজনাই নিশ্চুপ। আমি সত্যি সত্যি একটু অস্বস্তী বোধ করছিলাম। রবার্টসনও হয়ত ষ্টেলার বাবার মত আমাদের এনগেজমেন্টটা পছন্দ করছে না, কিংবা হয়ত—

আমি কিছু ব'লতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। কিন্তু রবার্টসনই সুরু করল ষ্টেলার হাতে তোমার দেওয়া এনগেজমেণ্ট রিংটা দেখলাম।

রবার্টসনকে অত্যন্ত ম্লান দেখাচ্ছিল সেদিন। ওর গলার স্বর অত্যন্ত করুণ ব'লে মনে হচ্ছিল।

আমি অত্যন্ত সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করে বললাম, হ্যাঁ, ষ্টেলা বলল সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা, এনগেজমেণ্টটা এখন হ'য়ে থাকলে পরীক্ষার পর বিয়েটা সেরে ফেলা যাবে।

রবার্টসন কপালের এক গাছি চুল আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে বলল ষ্টেলার কাছে সব শুনেছি।

আমি ভরসা পেয়ে বললাম ষ্টেলা খুব ভালো মেয়ে। আসলে ও আমার কান্ট্রি, মানে ইণ্ডিয়াকে ভালবেসে ফেলেছে। যদিও ইণ্ডিয়া ও চোখেই দেখেনি। আমার কাছে তার গল্প শুনেছে মাত্র।

হ্যাঁ ষ্টেলা খুব ভাল মেয়ে। ষ্টেলা তোমাকে ভালবাসে। রবার্টসন জড়িয়ে জড়িয়ে বলল।

আমি মৃদু হেসে বললাম ষ্টেলা তোমাকেও কম ভালবাসে না রবার্টসন। তোমার প্রতি ওর অফুরন্ত স্নেহ।

রবার্টসন হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল। বলল আমি জানি না। আমিও ষ্টেলাকে ভালবাসি। কিন্তু আমি জানি ও আমার কাছে চাঁদের চেয়েরও দুর্লভ।

রবার্টসনের কথায় আমি সর্ব্বনাশের ইঙ্গিত পেলাম। আমি বললাম ষ্টেলা কি সে কথা জানে ?

না। আমি ওকে বলতে সাহস পাইনি। কিন্তু ওকেনা পেলে আমি বাঁচব না। আমার হাত দুটো ধরে রবার্টসন বলল তুমি আমাকে দয়া করো করুনা করো।

আমার বুকটা যেন সহসা ফাঁকা হয়ে গেল। আমি বললাম কিন্তু আমি কি নিয়ে বাঁচব রবর্টসন আমিও যে সর্ব্বশান্ত হয়ে গেছি।

রবার্টসন এবারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এত কালের নিরুচ্চার প্রেমের বেদনা ওর চোখ দিয়ে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। আমি ওকে ছেলেবেলা থেকে ভালবাসি কিন্তু সে কথা ওকে কোনদিন সাহস করে বলতে পারিনি। ও আমাকে স্নেহ করে। শাসন করে কিন্তু আমি ওকে ভালবাসি।

আমি রবার্টসনের অশ্রুসজল চোখের দিকে তাকালাম। হৃদয়ের মধ্যে একটা সুতীব্র যন্ত্রনা অনুভব করলাম। এতদিন নিসপত্ন ভালবাসার মোহে আমি বিহ্বল হয়ে ছিলাম। এতদিন জানতাম

ষ্টেলা আমার। আমার একার। কিন্তু ভুল যখন ভাঙ্গলো চেয়ে দেখলাম আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদেরই একজন একান্ত সহচর যাকে শুধু স্নেহ করেছি। শুধু অনুকম্পা করেছি।

আমি যন্ত্রনায় ককিয়ে উঠলাম। আমার কথাগুলো আর্ত্তনাদের মত শোনাল কিন্তু আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব রবার্টসন আমি যে নিজেকে ষ্টেলার কাছে বিলিয়ে দিয়েছি। ষ্টেলাকে না পেয়ে বেঁচে থাকার কথা যে আমি ভাবতে পারি না।

আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে রবার্টসন বলল আমি জানি তোমার এবং আমার মধ্যে ষ্টেলা তোমাকেই বেছে নেবে। কিন্তু তবু আসি ষ্টেলাকে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। আমি জানি আমি অত্যন্ত অবুঝের মত কথা কলছি। তোমার বাগ্দত্তাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাচ্ছি। কিন্তু বিশ্বাস কর এ ছাড়া অন্য কোন ও উপায় খুঁজে পেলাম না। জয় করে নেবার শক্তি নেই, তাই দুহাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চাইছি। তোমার কাছে মিনতি করছি ষ্টেলাকে আমায় ভিক্ষে দাও।

এক অশুভ সুচনায় আমার মন ভ'রে উঠল। লণ্ডন শহরের এক অভিজাত হোটেলের নিওণ লাইটের অজস্র আলোকেও আমার মনে হচ্ছিল বুঝি বা সব অন্ধকার হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে একটা দারুন শূণ্যতা অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার সব শক্তি শেষ হয়ে গেছে। আমি যেন পাথর হয়ে গেছি।

সম্বিৎ ফিরল রবার্টসনের কথায়।

কি ভাবছ ?

আমি কিছু ভাবতে পারছি না রবার্টসন। আমার বোধ শক্তি পাথর হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করছি।

রবার্টসন বলল তুমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে, একটু ব্রাণ্ডি খাবে ?

আমি বললাম না ব্রাণ্ডির কোন ও প্রয়োজন নেই, কিন্তু এ তুমি

কি করলে রবার্টসন, এখন যে আমার আর কোন উপায় নেই। একথা তুমি আগে বলনি কেন যে ষ্টেলাকে তুমি ভালবাসো।

রবার্টেসন আকুল হয়ে বলল হয়ত বলতে পারতাম কিন্তু ষ্টেলা আঘাত পাব তাই বলিনি। ভেবেছিলাম—"

কি ভেবেছিলে ?

ভেবেছিলাম ষ্টেলাকে তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়ে নেব। কারণ তোমরা ইণ্ডিয়ান। তোমাদের দর্শন ও উপনিষদ আমি পড়েছি। আমি জানি ভিক্ষার্থীদের তোমরা কোরদিন বিমুখ কর না তাই—

আমি ম্লান হেসে বললাম সেই আশ্বাসে আমি আমার প্রাণের চেয়েও মূল্যবান সম্পদ ভিক্ষে চাইলে, কিন্তু রবার্টাসন আমি তো দেবতা নই, আমি মানুষ।

রবার্টসন বলল তুমি ভারতীয়। তোমাদের দেবতারাও নিশ্চয়ই ভারতীয় ছিলেন। তোমাদের ত্যাগের কথা আদর্শের কথা সমস্ত পৃথিবী জানে। এবং আমার বিশ্বাস ষ্টেলাকে হারানোর আঘাত তোমার বুকে শেল হয়ে বাজলেও তোমার প্রেমকে মহিমান্বীত করবার জন্য তুমি এই ত্যাগ স্বীকার টুকু করবে।

রবার্টসনের এই প্রশস্তী আমার কানে যাচ্ছিল না। আমি শুধু ভাবছিলাম ষ্টেলাবিহীন দূর্বিসহ জীবনের কথা। প্রেম মানুষকে দুর্বল করে। অবুঝ করে। তখন সব অনুভূতিগুলো ঠুনকো হয়ে যায়। মনে হয় এই বুঝি ভেঙ্গে পড়ব। আমি কাতর কণ্ঠে বললাম তুমি আমাকে মার্জনা কর রবার্টসন। আমি জানি ত্যাগেই প্রেমের সব চেয়ে বেশী সার্থকতা। কিন্তু ত্যাগ তো সকলের জন্য নয়। লক্ষ লক্ষ ভীষ্মের জন্ম হয় না পৃথিবীতে। তাই তাঁরা অনন্য। এই ত্যাগের জন্য আমি হয়ত তোমার চোখে চিরকাল মহান হয়ে থাকব কিন্তু আমি কি নিয়ে বাঁচব ? আমি দেবতা নই, মহাপুরুষও নই সামান্য একজন মানুষ। আমাকে তুমি সাধারণ মানুষের মত বাঁচতে দাও রবার্টসন। আমাদের জীবনে ভালবাসা একবারই আসে, কিন্তু

তোমাদের জীবনে ভালবাসা ফিরে ফিরে বহুবার আসে। আমার এই একজনার প্রতি অর্পিত ভালবাসা নিয়ে আমাকে বাঁচতে দাও রবার্টসন। আমার প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় নেই।

রবার্টসন ভীরু ভীরু গলায় বলল তোমার কথা আমি মানি। আমাদের ভালবাসা শিশুদের খেলনার মত। ভাল না লাগলে নতুন প্রেমের আস্বাদের জন্য মন উন্মুখ হয়। কিন্তু এ তো ভালবাসা নয়। এ শুধু ভালবাসার ক্যামোফ্লেজ। অবশ্য তুমি বলতে পারো আমিই যে ষ্টেলাকে নিয়ে সারাজীবন ঘর বাঁধাব তারই বা বিশ্বাস কি। কারণ আমার একনিষ্ঠ প্রেমের স্বপক্ষে কোন প্রমাণই আমি দিতে পারব না। কারণ ষ্টেলাকে আমি ভালবাসি সে কথা ও জানে না। তবু তোমার কাছে আমার মিনতি তুমি ষ্টেলাকে ফিরিয়ে দাও। তুমি তোমার প্রেমের সৌরভ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু আমি ষ্টেলাকে না পেলে বাঁচব না। তুমি আমাকে বাঁচাও।

রবার্টসনের কাতর মিনতিতে আমি মুহূর্তের জন্য দুর্বল হয়ে পড়লাম। মুহূর্তের জন্য আমি অনুভব করলাম আমি ভারতীয়। আমার দেশ ও দর্শন অন্যান্য দেশের কাছে এক মহৎ দৃষ্টান্ত। নাই বা পেলাম ষ্টেলাকে, ষ্টেলার স্মৃতি মনের মধ্যে নিরন্তর ষ্টেলার সুবাস বয়ে আনবে। এবং প্রেমের সার্থকতা শুধু মিলনেই নয়। প্রেমের বড় সার্থকতা ত্যাগে। আমার উদার ভারতীয় মন নিয়ে রবার্টসনের ভিক্ষার পাত্র আমি ভরে দিলাম। দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললাম তাই হবে রবার্টসন। ষ্টেলার জীবন থেকে আমি সরে যাব।

রবার্টসন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল আমি জানতাম। আমি জানতাম যে তুমি আমাকে ফেরাতে পারবে না। তুমি ভারতীয়। তুমি মহীয়ান। ক্রাইষ্ট তোমার মঙ্গল করবেন।

কফি হাউস জনশূন্য। কাউণ্টারে সেলস ম্যান ঝিমোচ্ছে। আমি ঘড়ি দেখে বললাম চল ওঠা যাক। রাত হয়েছে অনেক।

আমি আর রবার্টসন পথে নামলাম। রিজেন্ট পার্কের কাছে

রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে। একদিকে রবার্টসনের হষ্টেল অন্য দিকে আমার।

রবার্টসন আমাকে শুভরাত্রি জানাল। আমার মহান ত্যাগের জন্য আর এক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল রবার্টসন।

আমি খানিকক্ষণ রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে অপসৃয়মান রবার্টসনকে দেখতে লাগলাম। আমার মন যেন চীৎকার করে বলতে লাগল ওকে ফেরাও ও তোমার সবকিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। একবার ভাবলাম রবার্টসনকে ডেকে বলি না রবার্টসন, এ বেদনা আমি সইতে পারব না। আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিলাম, কিন্তু আমার ভারতীয় রক্ত আমাকে বাধা দিল। মহীয়ানের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আমি ভিখারীর মত বাসায় ফিরে এলাম।

ষ্টেলা কদিনের ছুটি নিয়ে ওর ভিলেজ হোমে গিয়েছিল, বিয়েতে ওর মা বাবার অনুমতি আনতে। আমি দুদিন উদভ্রান্তের মত লণ্ডনের পথে পথে ঘুরলাম। তারপর ষ্টেলা ফিরে আসার আগেই ইণ্ডিয়া হাউসের একজন কর্তা ব্যক্তিকে ধরে দেশে ফিরে আসার ব্যবস্থা করলাম এবং তৃতীয় দিনে গভীর রাত্রিতে ইন্টার-ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজের প্লেনে নিঃস্ব হয়ে দেশে ফিরলাম। ফাইন্যাল পরীক্ষার তখন মাত্র সাতদিন বাকী।

মনীশের কাহিনী শেষ হল। পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে একটি রাত্রির কয়েকটি মুহূর্ত বিধুর হল একজন বঞ্চিতের বেদনার কাহিনীতে। উত্তরের বাতাসে রাঁচী রোডের দুপাশের শিরীষ আব বিলিতি নিমের শাখায় শাখায় দোলা লাগল। সেই আবেগে শ্রীলা নিঝুম হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

মনীশ বলল সুখ কারো বা পায়ে পায়ে ফেরে। কেউ সারাজীবন অন্বেষণ করেও তার নাগাল পায় না। কিন্তু পৃথিবী তাদের কজনকে মনে রাখে?

পৃথিবী কাউকে মনে রাখে না। বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস বাতাসে

মিলিয়ে যায়। সে হতভাগ্য ভালবেসে কিছুই পেল না তাকে মনের দুঃখ মনের মধ্যেই গোপন রেখে বেঁচে-মরে থাকতে হয়, সে কি শ্রীলা জানে না।

হিমেল বাতাসে শিহরণ লাগল সারা শরীরে। শ্রীলা শালটা ভাল করে গায়ে জড়াল।

আকাশে আজ মেঘ নেই। আকাশে আজ অজস্র তারা। মনীশ শ্রীলার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সহসা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল তোমাকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে।

শ্রীলাও মুহূর্তের জন্য থমকে হেসে বলল তাই নাকি?

মনীশ বলল, সত্যি। মনে হচ্ছে একটুকরো তারা ভরা আকাশ তুমি শরীরে জড়িয়ে রেখেছো।

শ্রীলা বলল তোমার ভাল লাগছে?

শ্রীলার শালটার সাদা বুটিগুলো তারার মত ঝিকমিক করছিল। সেদিকে আবিষ্ট চোখে তাকিয়ে মনীশ বলল আগে যা দেখতাম তাই ভাললাগত। আজকাল দৃষ্টি বড় শুচিবায়ুগ্রস্ত। ভাল লাগাটাও বিরল হয়ে এসেছে। তাই হঠাৎ যখন কিছু দেখে ভাল লেগে যায় তখন সেই ক্ষণিকের ভাললাগাটুকু মনের মধ্যে স্মরণীয় করে রাখি।

ওরা নিঃশব্দে পথ হাঁটছিল। পথ এখন জনবিরল। রিজার্ভারটার মাথার বড় আলোটা বেশ খানিকটা জায়গা আলোকিত করে রেখেছে। বুড়ো দারোয়ানটা কম্বল গায়ে দিয়ে বারান্দায় বসে ঝিমোচ্ছে। বাতাসে শাল আর শিরীষফুলে একটা মেশানো সুগন্ধ।

বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি এসে ষ্টেলা জিগ্যেস করল, তোমার কাহিনীর শেষটুকু জানা হল না। এখন ষ্টেলা কোথায়?

মনীশ উদাস হয়ে বলল, জানি না। যে জীবন পিছনে ফেলে এসেছি, তার স্মৃতি আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে, কিন্তু তার জন্য কোন কৌতূহল বোধ করি না। দেশে ফিরে আসার সপ্তাহ খানেকের

মধ্যেই ষ্টেলার একটা চিঠি পেয়েছিলাম। ষ্টেলা আমার ঠিকানা জানত। ষ্টেলা শুধু জানতে চেয়েছিল, কেন আমি পালিয়ে এসেছিলাম। ষ্টেলা লিখেছিল যে সে ইচ্ছে করলে আমার সন্ধানে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসতে পারত। কিন্তু যে লোকটা বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হওয়ার পরেও চোরের মত পালিয়ে যায় তার প্রেম সম্বন্ধে ষ্টেলার গভীর সন্দেহ। সেই অবিশ্বস্ত প্রেমের টানে পলাতক প্রেমিকের কাছে আসতে সে রাজী নয়। আমার মত একজন ভীরু, দুর্বল মানুষকে রাগ বা ঘৃণারও যোগ্য বলে মনে করে না। কেন পালিয়ে এসেছি শুধু এইটুকুই সে জানতে উৎসুক। ওর চিঠির আমি জবাব দিইনি। তাবপর—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কথাটা শেষ করল মনীশ, তারপর আর জানি না।

এই মুহূর্তে শ্রীলারও মনে হল নিখিলেশও শ্রীলার রাগ বা ঘৃণারও যোগ্য নয়। নিখিলেশকে শ্রীলা করুণা করে। পরক্ষণে এও মনে হল যে নিখিলেশের এই নীরবতার পিছনেও হয়ত কোন কারণ থাকতে পারে। তাহলে ?

শ্রীলা বুঝতে পারে না কি করবে ও।

ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে শ্রীলা গুণ গুণ করে গাইছিল। উর্মিলা ঘরে ঢুকল।

কি রে আজ যে খুব খুশি খুশি ?

কোন কোনদিন হঠাৎ সব কিছু ভাল লেগে যায় ছোড়দি, তখন সেই ভাল লাগাটা গান গেয়ে প্রকাশ করি। শ্রীলা যেন ভাষান্তরে মনীশের কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করল।

উর্মিলা হেসে বলল হ্যাঁ বেড়িয়ে ফিরে আসার পর থেকে মনে হচ্ছে তোমার ভাল লাগাটা উপছে পড়ছে। ব্যাপার কি বল তো ?

ব্যাপার ? ব্যাপার কিছুই না। ভাল লাগা।

ভাল লাগা না ভালবাসা ?

শ্রীলা আরক্ত হ'ল। বলল ভালবাসা জীবনে দুবার আসে না ছোড়দি। প্রথমটা ভালবাসা, আর সব ভাল লাগা।

উর্মিলা এবার বলল কি ঠিক করেছিস বল? তাহ'লে বাবাকে লিখে দিই?

শ্রীলা চোখ তুলে জিগ্যেস করল কিসের?

উর্মিলা বলল কাল যা বলেছিলাম।

সে কথা শ্রীলার মনের মধ্যেও গুণ গুণ করছিল একটি অন্তরঙ্গ লোকগীতির মত। শ্রীলা না বোঝার ভান করে বলল একদম মনে ছিল না ছোড়দি। আজকার রাতটা ভেবে কাল সকালে নিশ্চয়ই বলব।

উর্মিলা চলে গেল। শ্রীলা ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিল বিছানায়। কিন্তু কোনটা বেছে নেবে শ্রীলা? শ্রীলা ভাবল, ভালবাসা না ভাল লাগা?

এবং অঘটনটা ঘটল ঠিক তার পরের দিনই। নরম মিষ্টি রোদ নিয়ে ডানা মেলেছিল সোনালী সকাল। শ্রীলা চন্দনাকে সাথে নিয়ে সার্কিট হাউসের পথ ধ'রে বেড়াচ্ছিল। ঠিক এই মুহূর্তে শ্রীলা কার কথা ভাবছিল মনে নেই, নিখিলেশের অথবা মনীশের। ওর চিন্তা যেন একটি অতি পরিচিত মানুষের রূপ ধরে সার্কিট হাউসের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল। না মনীশ নয়। তাহ'লে? মুহূর্তের জন্য শ্রীলা বিভ্রান্ত হ'ল। মনে হ'ল মনের ভুল। হাসিও পেল। ওর কি এখন শ্রীরাধার দশা চলছে? জগৎময় নিখিলেশ। না, সত্যি নিখিলেশ। নিখিলেশই। নিখিলেশ ওকে দেখেনি। ওদের আগে আগে পথ হাঁটছিল। পরণে সেই দার্জিলিং এর পোষাক। কোবাল্ট ব্লু সার্জের স্যুট। সাদার কারুকাজ করা নীল টাই। শ্রীলা দ্রুত পায়ে হেঁটে নিখিলেশের সামনে এসে ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল। অন্যমনস্ক ভাবে পথ হাঁটছিল নিখিলেশ। শ্রীলাকে দেখে থমকে দাঁড়াল তারপর চীৎকার ক'রে উঠল শ্রীলা—তুমি।

শ্রীলা সহসা কথা বলতে পারল না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এখন পথে লোক চলাচল সুরু হয়েছে। তাছাড়া এ পথে নানান্ বিচিত্র মানুষের আনাগোনা। নিখিলেশ তাড়াতাড়ি শ্রীলার হাত ধরে রাস্তার পাশে শিরীষ গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। চন্দনা ওদের দিকে হতবাক হ'য়ে তাকিয়ে একটা ঘাসের শীষ চিবোতে লাগল।

কান্নার আবেগ কিছুটা পশমিত হওয়ার পর শ্রীলা বলল এতদিন কোথায় ছিলে ?

নিখিলেশ শ্রীলার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল তোমার কাছে আমি অনেক অপরাধে অপরাধী শ্রীলা। দার্জিলিং থেকে ফেরার পর হঠাৎ একটা কেবল পেয়ে পোর্টব্লেয়ারে চলে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে সবে ফিরেছি।

কিন্তু তুমি তো আমার ঠিকানা জনতে একটা সংবাদ দেবার ও কি প্রয়োজন বোধ করনি ? শ্রীলার কণ্ঠে অভিমান, কিন্তু অনুযোগের সুরে তেমন জোর ছিল না। কারণ নিখিলেশকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ ওকে এমন বিহ্বল করে তুলেছিল যে ওর মনে হচ্ছিল ও বুঝি নিখিলেশের সব অপরাধ মার্জনা করতে পারে।

নিখিলেশ বলল নানা কাজের ঝামেলায় তোমাকে সংবাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি তাছাড়া শ্রীলা, তুমিই বলো হৃদয়ের উত্তাপ কি কুশল সমাচারের পত্রে জানানো যায় ?

শ্রীলা এ কথার জবাব দিল না। শুধু মনে মনে ভাবল যে চিঠিগুলি তোমার দিল্লীর ঠিকানা থেকে ফিরে এসেছে তার মধ্যে কতখানি উত্তাপ সঞ্চিত ছিল তা যদি তুমি জানতে।

কিন্তু তুমি উঠেছ কোথায় ?

সকালের ট্রেনে এসেছি। এখনও উঠিনি কোথাও। সার্কিট হাউস ভি. আই. পী তে ভর্ত্তি এখানে তিল ধারনের ও স্থান নেই। অগত্যা, হোটেল।

না। আমার সঙ্গে চলো। এখানে আমার দিদি জামাই বাবু থাকেন।

কিন্তু শ্রীলা—

না, কোন কিন্তু নয়। তোমাকে আমার সঙ্গেই যেতে হবে। এবং এখনই।

নিখিলেশ আর প্রতিবাদ করল না। শ্রীলার সঙ্গে উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। নিখিলেশের হাতে একটা এ্যাটাচি নিখিলেশের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চন্দনার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। চন্দনাও তাদের পিছু পিছু হাঁটছিল। একসময়ে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করবার জন্য বলল বাজারে যাবে না ছোটমাসী ?

শ্রীলা আর নিখিলেশে একসঙ্গে পথ হাঁটছিল। শ্রীলা নিখিলেশের পানে একবার তাকিয়ে দেখল। একটু রোগা হয়েছে নিখিলেশ। এ কদিনে নিশ্চয়ই অনেক ধকল গেছে ওর। শ্রীলা একবার ভাবল ওর এতদিনের রাগ অভিমান আর অভিযোগ একসঙ্গে শুনিয়ে দেয় ওকে। তারপর কেমন যেন মায়া হল। শ্রীলা শুধু বলল এতদিন যে কি দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি।

নিখিলেশ বলল সব অপরাধ আমার শ্রীলা। তোমাকে আমার অনেক কথা আছে বলবার। তোমার কাছে আমি যে অপরাধ করেছি—

বাধা দিয়ে শ্রীলা বলল এখন থাক।

নিখিলেশ আবার বলল সে কথা নয় শ্রীলা, এ অন্য কথা, এ আমার নিজের কথা, একান্তই নিজের।

সে কথা নাহয় পরেই বলবে।

না শ্রীলা, একদিন দার্জিলিংএ যেসব কথা তোমাকে বলবার সাহস সঞ্চয় করে তোমার কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম, সেদিনও তুমি আমায় বলতে দাওনি আজ আমায় বাধা দিও না।

শ্রীলা বলল, তোমার তো কিছুই বলার নেই, অনেক কিছু বলার

আছে আমার। তোমার কথা ভেবে কত রাত আমার ঘুম হয়নি জানো? কত রাত চোখের জলে ভোর হয়েছে সে খবর রাখো।

নিখিলেশ বলল সব জানি শ্রীলা। সব জানি বলেই সব কিছু তোমাকে বলতে চাই, না হলে তোমার কাছে আমি চিরদিন অপরাধী রয়ে যাব।

শ্রীলা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল সে কথা যদি আমার বুকে শেল হয়ে বাজে তাহলে বলার দরকার নেই। সে কথা যদি আমার স্বপ্নকে ভেঙ্গে চৌচির করে দেয় তাহলে সে কথা আমায় বল না আমি তা সইতে পারব না।

নিখিলেশকে চিন্তিত মনে হল। নিখিলেশ কি যেন ভাবছে। হয়ত এই নিঃসংবাদ দিনগুলি শ্রীলা কি দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছে সেই অপরাধে পীড়িতবোধ করছে নিখিলেশ অথবা হয়ত—

শ্রীলার সঙ্গে একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখে কিছুটা অবাকই হল উর্মিলা। এখানে তো শ্রীলার পরিচিত কেউ নেই। তাহলে কি উর্মিলা অনুমান করল ওর কলকাতার কোন বন্ধু, এখানে দেখা হয়ে গেছে হঠাৎ। কিন্তু শ্রীলার তেমন কোন পুরুষ বন্ধুর কথা তো জানা নেই উর্মিলার, তাহলে?

সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে শ্রীলা বলল ছোড়দি, নিখিলেশ। সার্কিট হাউসের পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

সেই অতি পরিচিত নাম, যে নাম নিয়ে এত মাতামাতি। হঠাৎ যেন স্মরণ করতে পারল না উর্মিলা। তারপর একসময় উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, তুমিই নিখিলেশ? এতদিন কোথায় ছিলে?

নিখেলেশ হেসে বলল নির্বাসনে। গিয়েছিলাম আন্দামান। সরকারী কাজে। সেখান থেকেই আসছি।

একই অনুযোগ করল উর্মিলাও। কিন্তু একটা সংবাদও কি দিতে নেই?

উর্মিলার কাছে সরাসরি দোষ স্বীকার করল নিখিলেশ, ভুল হয়ে

গেছে ছোড়দি। ভেবেছিলাম নিজে উপস্থিত হয়ে দোষ স্বীকার করব, কিন্তু তার আগেই শ্রীলার সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল, সুতরাং সব দিক দিয়েই কেস আমার বিপক্ষে।

উর্মীলা মনে মনে ভাবল এই দেখা হওয়াটা নিতান্তই আকস্মিক হলেও বোধ করি অমোঘ কারণ মন যখন প্রিয়জনের আসঙ্গ কামনায় বিধুর হয় তখন প্রেমের দেবতা অলক্ষ্যে হাসে। তা নইলে এত জায়গা থাকতে শ্রীলা পুরুলিয়াতেই আসবে কেন এবং নিখিলেশই বা আজকার দিনটিতেই এখানে উপস্থিত হবে কেন। কারণ আজই তো শ্রীলার কথা দেওয়ার দিন। বেচারা মনীশ। ওর অঙ্ক মিলবে না। তবু উর্মিলার মনে হল, এই যোগাযোগটা ঈশ্বরের আশির্ব্বাদ, এবং আরও মনে হল উর্মিলার, শ্রীলা ও নিখিলেশের বিবাহীত জীবন নিশ্চয়ই সুখের হবে। সেইদিন সন্ধ্যার ট্রেনে শ্রীলা আর নিখিলেশ কলকাতায় ফিরে গেল।

যাওয়ার সময় মনীশের সঙ্গে দেখা হল না শ্রীলার। সাহেব বাঁধের শীতের পাখী নাকি হঠাৎ অসময়ে উড়ে গেছে। তাই দেখতে গেছে মনীশ।

নিখিলেশের সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলেন ব্রজবিলাশ। মেজ বৌদিরও মুখে হাসি ফুটল। ইদানীং সুধন্যর কপালে কতকগুলো অস্থির বলীরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তা প্রায় নিমেষেই মিলিয়ে গেল। এ বাড়ীতে আবার খুশির বাতাস বইতে লাগল।

ব্রজবিলাস বললেন নিখিলেশ স্থিতধী এবং বুদ্ধিমান। আমাদের দেশের এই তরঙ্গ সঙ্কুল রাজনৈতিক সমুদ্রের লাইট হাউস এই এ্যম্বাসি অফিসগুলিতে এমনি মেধাবী অফিসারেরই প্রয়োজন।

রানী মাসীমা যাঁর মুখের আগল সর্বদাই খোলা থাকে, এবং তামাশার সময় যাঁর কাছে ছোট-বড় ভেদ নেই, তিনিও নিখিলেশের নম্রতায় মুগ্ধ হলেন।

তুমি তো ভারী সেয়ানা, রানী মাসীমা বললেন নিখিলেশকে, মেয়েটাকে দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে ওর পরীক্ষা নিচ্ছিলে বুঝি? নিখিলেশ লজ্জিত হল। কিছু বলল না।

নেপথ্যে রানী মাসীমা শ্রীলাকে বললেন, এ মানিক হারাসনে। আঁচলের গেরোয় বেঁধে রাখিস।

মুখ টিপে হেসে শ্রীলা বলল, সেই গেরো বাঁধার কায়দাটা শিখিয়ে দিও মাসি।

আমি হীরা ভেবে কাঁচ কুড়িয়েছি, তুই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিসনি। রাণী মাসিমার মুখে ম্লান হাসি।

কোন অসতর্ক মুহূর্তে রানী মাসীমার গোপন ব্যথাটা হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন রানী মাসীমা নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। যন্ত্রণাটা সমস্ত শক্তি দিয়ে রোধ করতে চান কিন্তু সেই অদৃশ্য ক্ষত মুখ থেকে রুধির নিসৃত হয় অবিরাম, তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন রানী মাসীমা। তখন তাঁর সব ঔজ্জ্বল্য, সব দিপ্তি হারিয়ে যায়। অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করেন রানী মাসীমা।

বিয়ের আগেই শ্রীলার সঙ্গে একই বাড়ীতে থাকতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ করছিল নিখিলেশ।

শ্রীলাকে নিভৃতে বলেছিল নিখিলেশ, ছিঃ ছিঃ এ ভারী লজ্জায় কথা।

কি? না বোঝার ভাণ করছিল শ্রীলা।

বিয়ের আগে কণের বাড়ীতে থাকা।

তাহলে কোথায় যেতে চাও? এখানে তোমার কোন আত্মীয়-স্বজন এমন কি বন্ধু-বান্ধবও নেই, তাহলে?

কেন, হোটেলে? হোটেলে বুঝি মানুষ থাকে না?

শ্রীলা নতকণ্ঠে বলেছিল, বিয়ের পর এ বাড়ীটা হবে তোমার নিজের বাড়ীর মত। এঁরা সবাই হবেন তোমার আপনজন। কদিন আগে থেকে সেকথা ভেবে নিলে দোষ কি? বিয়েটা

একটা সামাজিক অনুষ্ঠান, একটা পারস্পরিক স্বীকৃতি বই তো নয়।

শ্রীলার যুক্তি খণ্ডন করতে পারেনি নিখিলেশ। ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল, সে কথা ঠিক। কিন্তু তবুও অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করছি! অন্ততঃ বর্তমানে তোমাদের বাড়ীতে আমার পরিচিতি জামাই বলে নয়। ভাবী জামাই। আর শ্বশুর বাড়ীতে ভাবী জামাইয়ের কোন অধিকার থাকে না।

দ্বিধা সঙ্কোচগুলো গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিও। তুমি একটি মানুষ যাকে এ বাড়ীর একটি মেয়ে ভালবাসে, এই পরিচয়ই যথেষ্ট। আপাততঃ তোমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কে কোথায় আছেন তাঁদের ঠিকানাটা দাও।

মৃদু হেসে নিখিলেশ বলল, তোমরা আমার সম্বন্ধে ইনভেষ্টিগেশন সুরু করেছ নাকি?

শ্রীলা ধমকে উঠল, ফের? ওকথা বলবে না বলছি। তোমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের নেমন্তন্ন করতে হবে না!

আমার বন্ধু কেউ নেই শ্রীলা। আমার একমাত্র বন্ধু তুমি। দিল্লীতে মানুষ হয়েছি। ছেলেবেলা থেকে নানান জায়গায় একটা আশ্চর্য পরিবেশের মধ্যে কাটিয়েছি, সেখানে মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ট্রেনের কামরায় সহযাত্রীর মত। পরিচয় হয়েছে, কিন্তু বন্ধুত্ব হয়নি।

আত্মীয়-স্বজন?

কেউ নেই। নিকটাত্মীয় বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা কেউ পৃথিবীতে নেই। তাঁদের অবর্তমানে যারা সে স্থান পূরণ করতে পারতেন আমার সঙ্গ বিমুখতার জন্য তাঁরাও দূরে সরে গেছেন। তাঁদের কোন দোষ ছিল না। তাঁরা আমাকে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বজন বিমুখতা আমাকে দীর্ঘদিন হণ্ট করে বেরিয়েছে। আত্মীয়-স্বজনরা নিরুত্তাপ হয়ে ফিরে গেছেন। আজ তাঁদের ডেকে আনার মুখ

নেই। আজ আমি একা। আজ তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই!

শ্রীলা বিহ্বল হল। নিখিলেশের চোখে চোখ রেখে বলল, আমি আছি, আমি থাকব।

অপরিসীম বিশ্বাসে দৃপ্ত হয়ে উঠল নিখিলেশের দুই চোখ। নিখিলেশ বলল, শ্রীলা, এ শপথ তুমি ভুলে যাবে না তো?

পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে নিখিলেশের বুকে মাথা গুঁজে শ্রীলা বলল, না।

নিখিলেশ বলল, শ্রীলা আমার জীবনের নেপথ্যে অনেক কাহিনী জমে আছে। হয়ত সে আমার অনেক অপরাধের বোঝা। আমি বার বার তোমার কাছে বলতে চেয়েছি তুমি আমাকে থামিয়ে দিয়েছো। আজ আমি যেখানে এসে পৌঁছেছি সেখানে দাঁড়িয়ে সেসব কথা তোমাকে বলতে পারব না। পারব না, কারণ তোমাকে আমি ভালবাসি। তবু একটা কথা তোমাকে বলা প্রয়োজন বোধ করছি শ্রীলা, জীবনে হয়ত এমন দিনও আসতে পারে, সেদিন তোমার মনে হবে ওয়েসিস ভেবে এতদিন তুমি মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছো, কথাগুলো কবিত্বের মত শোনালেও আমি নিরুপায় কারণ এর চেয়ে ভালো উপমা খুঁজে পেলাম না। সেদিন তুমি আমাকে ছেড়ে যেও, সে ব্যথা আমার বুকে শেল হয়ে বাজলেও আমি তা সহ্য করব, কিন্তু দোহাই তোমার সেদিন যেন তুমি আমায় ঘৃণা কর না।

শ্রীলা আবেগের সঙ্গে বলল, তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না। কোনদিন না।

বিয়েতে উপহৃত নানান্ সামগ্রীর মধ্যে দুটি বিশেষ ভাল লাগল শ্রীলার। একটি পাঠিয়েছে ওর বিদেশিনী বৌদি। একজন বিদেশী ভাস্করের তৈরী যোগিণী পার্বতীর মর্ম্মর মূর্ত্তি তপঃশীর্ণা, চারুদর্শিনী

গৌরী। দৃষ্টি কোন সুদূরে নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে প্রেম, জিগীসা, তন্ময়তা আশ্চর্য্য সজীব হয়ে ফুটে উঠছে। অপরটি একটি প্রাকৃত ভাস্কর লেখা তাম্রশাসন। মনীশ পাঠিয়েছে পুরুলিয়া থেকে। সঙ্গে একটা চিরকুট। আরও একটা সংবাদ ছিল তার মধ্যে। মনীশ লিখেছে, সেদিন, অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেম। কেন জানি না বার বার আপনার কথা মনে পড়েছিল। এখানে একটা ঝর্ণা আছে। আর আছে গাছের ডালে জড়িয়ে থাকা এক ধরণের লতা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন স্নান করতে গিয়ে অসাবধানে মেয়ের চুল গাছের ডালে জড়িয়ে আছে। বিন্দু বিন্দু শিশির জমে আছে তাতে। এখানের মানুষদের বিশ্বাস একদা রক্ষরাজের বিধান। এই পথ দিয়ে সীতা দেবীকে হরণ করে নিয়ে যাবার সময় তাঁর কয়েক গাছি চুল গাছের ডালে আটকে গিয়ে ছিল। তাই দেখে শ্রীরামচন্দ্র খুঁজে পেয়েছিলেন পথের নিশানা। এ শুধু এখানকার মানুষদের প্রচলিত বিশ্বাস। শ্রীরামচন্দ্র পথের নিশানা খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু ফেরার পথে কুড়িয়ে পেলাম বৌদ্ধ যুগের এক তাম্রশাসন। প্রাচীন ভাষায় যা লেখা আছে তার মূল অর্থ সুন্দর : শাশ্বত এবং কয়েকটি বাণী, যার বাংলা অর্থ জীবনকে আপন করো মৃত্যুকে আপন করো সুখকে আপন করো দুঃখকে আপন করো প্রেমকে আপন করো বিচ্ছেদকে আপন করো। আমার জীবনে অনেক সুন্দর শাশ্বত হয়নি, তাই ভাবলাম এ শুধু কোন প্রিয়জনকেই উপহার দেওয়া যায়। কদিন পরেই আপনার বিয়ের সংবাদ পেলাম। এটা তাই আপনাকেই উপহার পাঠালাম।

তাম্র শাসনটাতে সামান্য সংস্কার করেছে মনীশ। চন্দন কাঠের একটা সুদৃশ্য ফ্রেমে তাম্রশাসনটা বাঁধানো। পাশে একটা ফোটো ষ্ট্যাণ্ড। তলায় শুধু দুটি কথা লেখা সুন্দর : শাশ্বত এবং বাণীগুলি।

অতএব এবার ঘর বাঁধতে হবে। কলকাতার উপকণ্ঠে একটা বাড়ী ঠিক করল নিখিলেশ। দু-কামরার ফ্ল্যাট, সুধন্যর পছন্দ হয়নি.

বাড়ীটা। সুধন্যর ধারণা ছিল হয়ত এই অপরিসর ঘরে বাস করা শ্রীলার পক্ষে অসুবিধাজনক হবে। সে কথা মেজবৌদিকে বলেছিল সুধন্য। এই খোলামেলা বাড়ী ছেড়ে ওই ছোট্ট ফ্ল্যাট বাড়ীতে থাকতে অসুবিধা হবে শ্রীলার।

না ?

কেন ?

বিয়ের পরে শুধু স্বামীর সাহচর্য্যে মেয়েরা কুঁড়েঘরেও সুখের স্বর্গ রচনা করে। অনেক অসুবিধাই তখন মনে থাকে না। পরে যখন স্বামী নামক নেশাটা কাটতে আরম্ভ করে অসুবিধা গুলো তখন গা-সহা হয়ে যায়।

হবে ও বা। সুধন্য অতশত বোঝে না। ব্রজবিলাস তো এসব ব্যাপারে একেবারে নির্বিকল্প। সুনীত হেসেই উড়িয়ে দিল কথাটা।

ঘর ? তুমি কি বলছ মেজদা। এ বিষয়ে নবাব সিরাজউদ্দোল্যার কথাটাই ঘুরিয়ে বলা চলে, একখানি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে একযুগ পূর্বে বিবাহিত একটি দম্পতির বসবাস করা অসুবিধা জনক হইলেও একখানি পূর্ণকুটিরে একটি নববিবাহিত দম্পতি অন্তত একবৎসর অত্যন্ত আরামের সঙ্গে বসবাস করিতে পারে। সুতরাং একবছরের জন্য নিশ্চিন্ত।

সুধন্য স্বভাবতঃই একটু গম্ভীর প্রকৃতির। তবু সুনীতের কথা বলার ঢং এ হেসে ফেলল সুধন্য। বিশেষ করে একযুগ পূর্বে বিবাহিত দম্পতি কথাটার মধ্যে সুধন্য আর মেজবৌদির প্রতি ইঙ্গিত ছিল বলে। এবং অসুবিধার কথাটা নিতান্তই বানানো। কারণ সুধন্য আর মেজবৌদি একটি সুখী দম্পতি।

মেজ বৌদি চোখ রাঙিয়ে বললেন তবে রে, আবার আমাদের ঠেস দিয়ে কথা বলা হচ্ছে।

সুনীত জড়সড় হয়ে বলল মাফ করো বৌদি, আমার খেয়ালই ছিল না যে তোমাদের দ্বাদশ বিবাহ বার্ষিকী সবে সমাপ্ত হয়েছে।

কারণ এখনও তোমার হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে যাওয়া দেখে মনে হয় এই সবে নূতন বৌ হয়ে ঘরে এসেছো।

আবার মেজ বৌদি চটে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে শ্রীলা ঘরে ঢুকল।

সুনীত চেঁচিয়ে উঠল আরে, কি খবর ছোট যে? তোর কথাই হচ্ছিল।

শ্রীলা হেসে বলল, এখন কিছুদিন তো সব সময়ে আমার কথাই হবে। দুদিন বাদেই সব ভুলে যাবে।

আরে নারে না, ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ। কেমন সংসার পেতেছিস বল?

উঁহুঁ। মুখে বলতে পারব না। একদিন এসে দেখে যেও।

তুই নেমন্তন্ন করবি না? এখন তো আমি শুধু তোর দাদা নই, বলতে গেলে তোদের কুটুম্ব।

তুমি কি নেমন্তন্নের অপেক্ষা রাখো নাকি ছোড়দা?

কেন? সুনীত ভ্রু কুঁচকে বলল, কুঁজোর যদি চীৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে করে তাহলে আমারই বা সামাজিক জীব হতে ইচ্ছে করবে না কেন?

মৃদু হেসে শ্রীলা বলল, না। সমাজ জিনিষটাকে তুমি তো বহু আগেই গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছ। রক্তের টান বলে আমাদের ছাড়তে পারো না। নইলে তুমি কি কারো কথা মনে রাখো।

সুনীত বুঝলো এ শ্রীলার ক্ষোভের কথা নয়, অভিমানের কথা। যে অভিমানে ললিতাও বুক ভরা ব্যথা নিয়ে সরে গিয়েছিল একদিন। কিন্তু ললিতা আজ কোথায়? হঠাৎ ভারী জানতে ইচ্ছে করে সুনীতের। কিন্তু নিজের অহমিকার নির্মোক ছেড়ে সুনীত বেরোতে পারে না। একটা সঙ্কোচ আর দ্বিধার জাল আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। ললিতা তার মাঝে হারিয়ে যায়। শুধু

মনের মধ্যে একটা মিষ্টি ব্যথার মত কখনও টনটন করে আবার কখনও অন্যমনস্কতায় হারিয়ে যায়। ললিতা—ললিতা—সুনীত ক্ষণিকের জন্য উন্মনা হয়ে যায়।

সে ভাবটুকু লক্ষ্য করেই শ্রীলা বলে, ছোড়দা একটা কথা বলব?

সহসা চেতনায় ফিরে আসে সুনীত। তারপর ওর সপ্রতিভতা ফিরিয়ে এনে বলে, বল না, এত কিন্তু কিসের?

তুমি এবার একটা বিয়ে করো না?

কেন, মেজ বৌদিকে বুঝি আর ভাল লাগছে না?

না, না, তা কেন। আমাদের বুঝি সখ হয় না তোমার বৌ দেখতে?

জীবনে সব সখই কি মেটে শ্রীলা? কিছু কিছু সখ আর স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। সেগুলোর দাম নেহাৎ কম নয়।

ছোড়দা বুঝি আজকাল দর্শন পড়ছ?

আজকাল নয়। কতকাল ধরে। সেই যবে থেকে চাকরীতে ঢুকেছি। ফিলজফি অব ইনস্যুরেন্স. ভাল কথা, খবর নিস তো নিখিলেশের কোন ইনস্যুরেন্স আছে কিনা। না থাকলে করিয়ে নিতে বলিস। যতই হোক, এখন বিয়ে করেছে দায়ীত্ব বেড়েছে তো।

ওর চেয়ে তোমার দায়ীত্বই বেশি মনে হচ্ছে?

না না ছোট, হাসির কথা না। তুই খবর নিস তো, ও কত মাইনে পায় এবং লাইফ ইনস্যুরেন্স থাকলে তার প্রিমিয়াম কত দিতে হয়, তাহলে আমি হিসেব করে বলে দেব ওর মাইনে অনুপাতে ওর যা ইনস্যুরেন্স আছে তা পর্য্যাপ্ত কিনা, অথবা কম থাকলে আরও কত করানো প্রয়োজন, ইত্যাদি।

শ্রীলা জোড়হাত করে বলল, মাফ করো ছোড়দা, ও কোথায় চাকরী করে বা কি চাকরী করে তাই এখনও জিগ্যেস করতে পারলাম না, তার সামনে—

বলিস কিরে রে ছোট। গালে হাত দেয় মেজবৌদি, বিয়ের আগে যা জানা প্রয়োজন ছিল বিয়ের পরেও তা জেনে নিসনি ?

না বৌ'দি। মানুষটাকে বিয়ে করেছি, ওর চাকরীটাকে তো বিয়ে করিনি। তাছাড়া এখন আর কি হবে জেনে। মাসের শেষে মাইনে বলে যে খামটা আমার হাতে তুলে দেয় তার মধ্যে অর্থের পরিমাণ চার অঙ্কে। কাজেই কি চাকরী করে সেকথা শুধোবার প্রয়োজন স্বভাবতঃই বোধ করিনি।

তা বেশ করছিস। সুনীত বলল, কিন্তু ঝাল ঝোল অম্বল দিয়ে বেশ পরিপাটি করে খাওয়াচ্ছিস কবে বল তো ?

উচ্ছসিত হয়ে শ্রীলা বলল, তোমার যেদিন ইচ্ছে। শুধু ঘণ্টা খানেক আগে আমাকে তোমার আসার সংবাদ দিও, তাহলেই হবে।

সুনীতের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঠিক আগের মত যত্ন করে খেতে দিস ছোট। মা যেমন করে খেতে দিতেন। আসন পেতে ঠাঁই করে খাওয়ার সামনে পাখা হাতে নিয়ে বসে যেমন বাতাস করতেন।

ঠিক তেমনি করে খাওয়াব তোমাকে ছোড়দা। তুমি বলো, আসবে তো ?

মায়ের কথায় হঠাৎ চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছিল সুনীতের। একদিন মায়ের স্নেহের বখরা নিয়ে কত ঝগড়া করেছে দুজনে।

মুখ ফিরিয়ে চোখটা মুছে সুনীত বলল, আসব রে আসব। নিশ্চয়ই আসব।

বিবাহোত্তর জীবনের সুধার পাত্র ভরে উঠল কানায় কানায়। তখন শ্রীলার মনে হয়েছিল পৃথিবীতে অনেক সুখ। এমন কি একবার একথাও মনে হয়েছিল যে দুঃখ মানুষের স্বসৃষ্ট একটি অনুভূতির নাম। সুখ বড় সহজলভ্য। তার জন্য মনটাকে ঈষৎ

নমনীয় করতে হয়। মেনে নিতে হয় অনেক দুঃখকে সুখের নেপথ্যে। বাপের বাড়ীর সেই সুপরিসর অট্টালিকার আয়েস ছেড়ে এই পায়রার বাসার মত ছোট্ট একখানি বাড়ী তাই অসহ্য মনে হয়নি শ্রীলার। অনেক মনোরম মনে হয়েছিল কারণ আশ্রয় এখন একটি গৌণ প্রয়োজন মাত্র। এ বাড়ীতে শুধু দুজন মাত্র প্রাণী। শ্রীলা আর নিখিলেশ। তাই নিখিলেশ অফিসে যাওয়ার পর শ্রীলার অখণ্ড অবসর। শ্রীলা এখন সীমাস্বর্গের রাজেন্দ্রানী। বাপের বাড়ীর আত্মীয় ও শ্রীলার বিশেষ অন্তরঙ্গ কয়েকজন বন্ধু ছাড়া এ বাড়ীতে আর কারও আনাগোনা নেই। নিখিলেশের কোন পরিজন অথবা বন্ধুবান্ধব।

শ্রীলা মাঝে মাঝে অবাক হয়। নিখিলেশের মত সুচারু হৃদয়-বৃত্তি সম্পন্ন মানুষের কোন বন্ধু নেই কেন? আত্মীয়হীন অনেকে থাকে কিন্তু নির্বান্ধব মানুষের সংখ্যাসংসারে বিরল।

নিখিলেশ বলে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার অবকাশ পেলাম কই? জীবনের এতটা দিন কেটে গেল ফেরীর নৌকোর মত এপার ওপার করতে করতে। স্থায়ী নোঙ্গর ফেলে বন্দরে নাও ভিড়াতে না পারলে কি জনতার সঙ্গে পরিচয় হয়?

শ্রীলা অভিমানের সঙ্গে বলে আমার কিন্তু ভারী সাধ হয়। এ বাড়ীতে তোমার বন্ধুবান্ধবরা আসবে। আড্ডা দেবে। সময়ের হিসেব থাকবে না কোন। আমি রাগ করব, তারপর—তারপর।

তারপর আমি অনেক করে সাধব, লক্ষ্মীটি আর কোনদিন এমন হবে না। তখন তোমার রাগ ভাঙ্গাবে এবং তারপরও আমি সময়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেব, তুমি আবার রাগ করবে, আবার আমি তোমার রাগ ভাঙ্গাব এবং আবার, আবার, কারণ রাগ করতেই তোমার আনন্দ আর আমার আনন্দ রাগ ভাঙ্গানোতে।

—এবং যেদিন তুমি সত্যিই হয়ত তোমার আড্ডায় যাবে না অথবা তোমার বন্ধুরা কেউ আসবে না, সেদিন সত্যিই আমার ভারি ফাঁকা ফাঁকা লাগবে, আমি ভাবব কি যেন নেই কি যেন নেই—

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিখিলেশ বলল এ শুধু অলীক কল্পনা। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে স্বপ্ন দেখার মত, কারণ আমার কোন বন্ধুই নেই।

বন্ধু নেই। কত সহজে কথাটা বলতে পারল নিখিলেশ। কিন্তু কেন নেই?

তবে একটা সুবিধে, এখন আর নিখিলেশকে ট্যুরে যেতে হয় না। কিন্তু অফিসের সময়টুকু বাদ দিয়ে প্রায় সারাসময় বাড়ীতেই থাকে নিখিলেশ।

শ্রীলা মাঝে মাঝে অনুযোগ করে সারা সময় শুধু বাড়ীতেই বসে থাকো, বেরোতে ইচ্ছে করে না?

পাশ বালিশটা দুমড়ে কনুই-এর নীচে চেপে নিখিলেশ বলল যতটুকু সময় তোমাকে কাছে পাওয়া যায়।

শ্রীলা বলল আহা, যেন আমার জন্যই বাড়ীতে থাকা। বাইরে তো বাবুর বন্ধু নেই যাবে কোথায়?

নিখিলেশ কাছে এসে শ্রীলাকে আদর করে বলল বিশ্বাস করো শ্রীলা। শুধু তোমার জন্যই। বন্ধু না থাকলেও পার্ক আছে, সিনেমা আছে, রেস্তোঁরা আছে, কিন্তু আমি শুধু তোমার জন্যই বাড়ীতে থাকি। শুধু তোমাকে দেখব বলে। তোমার ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে ওঠা, তোমার ভ্রূকুটির তলায় ডাগর দুই চোখ তোমার চুড়ির মিষ্টি আওয়াজ, তোমার পায়ের শব্দ, সব আমার ভাল লাগে, সব। এর কারণ কিন্তু আমার আদেখলেপনা নয়। এর কারণ—

শ্রীলা চোখ তুলে তাকাল।

এর কারণ, সুখ আমার কপালে সয় না। তাই সুখ নামের শুকপাখীকে খাঁচায় ধরে রাখতে চাই।

কেন হারানোর ভয় আছে নাকি?

শ্রীলার মুখ চেপে ধরে নিখিলেশ ও কথা বল না, ও কথা বল না শ্রীলা। ছেলে বেলার থেকে এমনী একটা ভয় আমাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে, যা পেয়েছি পাছে তা হারিয়ে ফেলি। এবং সব ভরসা ও বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আমার আশঙ্কাই শেষ পর্য্যন্ত সত্যি হয়েছে। এমনী একটা আশঙ্কার বীজ তুমি আমার মনের মধ্যে রোপন করে দিও না শ্রীলা। কারণ তোমাকে আমি হারাতে পারব না।

শ্রীলাও সত্যিই সুখী হতে চেয়েছিল। সুন্দর ও শাশ্বত একটি জীবনের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে বারোটি মাস আছন্নের মত কাটিয়েছিল। কিন্তু সুখ নামের সেই সুক পক্ষী খাচায় থাকেনি বারোটি মাসের বেশী, একদিন পায়ের শেকল কেটে উড়ে গিয়েছিল উদার আকাশে। সেদিন শ্রীলা রিক্ত। শ্রীলার জীবনে মনীশের উপহার দেওয়া তাম্র-শাসনের সেই সুন্দর ও শাশ্বতর বাণী মিথ্যে হয়ে গেছে। ভীরুকে ক্ষমা করা যায়, ক্ষমা করা যায় বিজিত প্রেমিকাকে, কিন্তু যে প্রতারক তাকে ক্ষমা করা যায় না। ক্ষমা করা যায় না, যে একটা দুরভিসন্ধির মন নিয়ে তার কুমারী জীবনকে কলঙ্কিত করেছে তাকে। এই বারোটি মাস শ্রীলা প্রতিদিন নতুন করে ঘর সাজিয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই ও টবে নতুন ফুল ফুটিয়েছে। প্রতি-দিনই নতুন সাজে অভিসারিকা শৃঙ্গার নটির মত নিখিলেশের চোখে নেশা ধরিয়েছে। সারা দিনের কর্মক্লান্ত নিখিলেশ যেন তার অবসর সময়টুকুতে শ্রীলার সুবাসে বুঁদ হয়ে থাকত। অথচ এই নিখিলেশ—

অঘটনটা যেদিন ঘটল সেদিন ওদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকী। ঠিক তার আগের দিন এল ললিতা আর প্রীতম। একটা খুশীর কাল বৈশাখীর মত, একটা পাহাড়ী নদীর উচ্ছল বন্যার মত। ওরা মনস্থির করে ফেলেছে, এবার ওরা ঘর বাঁধবে। তরী নোঙ্গর করবে তীরে।

ললিতাকে আবেগে জড়িয়ে ধরল শ্রীলা। অভিমানের সঙ্গে বলল, আমার বিয়ের সময় এলি না কেন?

ললিতা শ্রীলার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তখন আমার শ্রীরাধার দশা চলছিল। তারপর গুণগুণ করে গেয়ে উঠল—

রাতি কৈনু দিবস
দিবস কৈনু রাতি
বুঝিতে নারিনু বন্ধু
তোমারও পীরিতি।

তাই বুঝি? শ্রীলা হাসি মুখে বলল, তাহলে বোধহয় ক্ষমা করা চলে। কারণ ঈশ্বর বলেছেন মৃতকে, নির্বোধকে এবং প্রেমিককে করুণা করবে।

ললিতা গম্ভীর কণ্ঠে চোখ বুজে বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বলল, আমেন—আমেন।

হেসে উঠল সবাই।

প্রীতম এখন ঈষৎ লাজুক। সমতলে এসে প্রীতম বোধহয় অস্বস্তী বোধ করছে। ও একটা পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিল। শ্রীলা প্রীতমের মুখোমুখি বসে বলল।

আমার বিয়েতে না আসায় অত্যন্ত দুঃখীত হয়েছি।

প্রীতম হেসে বলল, দুঃখ কতদিন ধরে আপনারা মনে রাখেন। এক বছর আগে আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি, সেই ক্ষোভ এখনও মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রেখেছেন?

শ্রীলা ঈষৎ অনুযোগের সঙ্গে বলল, সময়টা বড় কথা নয়। এ দুঃখ যতদিন বেঁচে থাকব ততদিনই মনে থাকবে। কারণ উপলক্ষ্যটা জীবনে বার বার ফিরে আসে না।

সঙ্কোচের সঙ্গে প্রীতম বলল সে অভিশপ্ত দিন যেন আপনার জীবনে না আসে। কিন্তু বিয়ের দিনটা যেন জীবনে বহুবার ফিরে ফিরে আসে এই কামনা করছি।

হঠাৎ হাততালি দিয়ে ললিতা বলে উঠল আর শ্রীলা ভালই তো সেই দিন, শুভ উনত্রিশে ফাল্গুন ?

লজ্জায় রঙ্গিন হয়ে শ্রীলা বলল হ্যাঁ।

ললিতা একমুখ হাসি নিয়ে বলল কাল তাহলে তোর এখানে আমাদের নেমন্তন্ন, কি বল প্রীতম ?

শ্রীলা সঙ্কোচের সঙ্গে বলে উঠল ছিঃ ছিঃ কি অন্যায়। আমারই একথা আগের থেকে বলা উচিত ছিল।

প্রীতম বলল তাতে কি হয়েছে। বিয়ের কথা স্মরণে এলে সবাই উন্মনা হয়ে যায়।

হেসে উঠল সবাই।

কিন্তু সেই দীর্ঘ প্রতিক্ষীত ব্যক্তিটি কোথায় ?

এতক্ষণ নিশ্চয়ই পথে শ্রীলা বলল।

অথবা পান্থশালায় প্রীতম বলল।

শ্রীলা সজোরে প্রতিবাদ করে বলল কখনও নয়। অফিস থেকে সোজা বাড়ী চলে আসে।

তেরছা চোখে তাকিয়ে প্রীতম বলল বেশ পোষ মানিয়েছেন তো ?

আপনিও মানবেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল নিখিলেশ। প্রীতম বলল আপনার কথাই হচ্ছিল।

নিখিলেশ মৃদু হেসে বলল আমি ভাগ্যবান।

প্রীতম বলল ভাগ্য আপনার ঈর্ষা করার মত। অন্তত স্ত্রী ভাগ্য। এমন স্ত্রীর দাসানুদাস হয়ে থাকতে সারাজীবন আপত্তি নেই।

নিখিলেশ ভ্রূ কুঁচকে বলল এটা তো কম্‌প্লিমেণ্ট বলে মনে হচ্ছে না।

আপনার প্রতি কম্‌প্লিমেণ্ট না হলেও শ্রীলার প্রতি তো বটেই। অফিস থেকে এক মিনিটও দেরী না করে যে স্বামী বাড়ী চলে আসে—

তার ভাগ্য ঈর্ষা করার মতই—কথাটা শেষ করে নিখিলেশ কিন্তু কথাটা কি জানেন, আমি বাস্তবিকই বন্ধু হীন। শ্রীলাই আমার একমাত্র বন্ধু আমার আশ্রয়, আমার আনন্দ।

চায়ের টেবিল ঘিরে সন্ধ্যা মুখর হল। উঠে যাওয়ার সময় প্রীতম বলল জীবনটাকে নানা দিক দিয়ে দেখলাম। মনটাকে বিশ্লেষণ করে দেখলাম জীবনের উদ্দেশ্য কি, সুখ, না আনন্দ, বুঝলাম দুইই, শুধু বুঝলাম না কি আমি চাই, কি আমার জীবনের ধ্রুবপদ—।

শ্রীলা উঠে গিয়ে ওদের যুগ্ম ফটোগ্রাফ ও তাম্রশাসনটা নিয়ে এল।

প্রীতম বলল প্রেমকে আপন করো, বিচ্ছেদকে আপন করো, বাঃ চমৎকার।

ঠিক সেইদিনই সন্ধ্যায় হঠাৎ সুনীত এল বর্দ্ধমান থেকে। তেমনি খুশির দমকা হাওয়ার মত। মোটর সাইকেলটা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে প্রায় সেখান থেকেই চীৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকল সুনীত। একদিন আগেই এসে পড়লাম রে ছোট। তোর বিবাহ বার্ষিকী একদিন আগে থেকেই উদযাপন করব বলে। যেমন উৎসবের আগের দিন জাগরণ।

এক বছরের মধ্যে এই তোমার আসবার সময় হল ছোড়দা? আসব বলে কতবার কথা দিয়েছ বল তো?

কতবার কথা দিয়েছি মানে। কতবার যে কতকথা রাখিনি তারই কি হিসেব আছে। কিন্তু এবার আর কথার খেলাপ করব নারে ছোট। এবার আমি ভালো হয়েছি, সুর করে' গাইল সুনীত।

তাই নাকি ছোড়দা? তুমি কি প্রেমে পড়েছ নাকি?

হো হো করে হেসে উঠল সুনীত সেই প্রেম, যে প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে—নারে, এবার আমি ক'লকতা দিল্লী মোটর সাইকেল র‍্যালীতে নাম দিয়েছি।

সুনীত হয়ত কবিতাটা আরও খানিকটা আবৃত্তি করত কিন্তু সহসা দরজায় কার ছায়া দেখে সুনীত চীৎকার করে উঠল ওকে? ওকেরে ছোট।

শ্রীলা বলল। ললিতা।

ললিতা! সুনীত বিস্মিত হল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল ললিতা।

সুনীত একটু বিচলিত বোধ করল। তারপর সেভাব সামলে বলল ললিতা কেমন আছো?

ললিতা মৃদু কণ্ঠে বলল ভালো তুমি কেমন?

সুনীত হেসে বলল কেমন দেখছ?

ললিতা ভ্রূকুটি করে বলল। দেখে কি বোঝা যায়?

সুনীত বলল ভালোটা, হয়ত সব সময় বোঝা যায় না। কিন্তু মন্দটা বোঝা যায়। চোখে মুখে তার ছাপ পড়ে।

ললিতা আবার বলল আমাকে দেখে কি মনে হয়?

সুনীত বিব্রত বোধ করছিল ললিতার কথায়। তবু জবাব দিল তুমি তো সাধারণের ব্যতিক্রম।

ললিতা ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে বলল মিথ্যে কথা। আমি সাধারণ। অত্যন্ত সাধারণ। সাধারণের ব্যতিক্রম বরং তুমি। নিজের চারপাশে একটা অহমিকার প্রাচীর তুলে নিজেকে অসাধারণ করে তুলতে চাও। আমি অত্যন্ত সাধারণ একটি মেয়ে। সাধারণ সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। তুমি কি এসব বোঝ?

সুনীত জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না। নত কণ্ঠে শুধু বলল আজ এসব কথা কেন ললিতা?

তোমার সঙ্গে বোঝাপড় করবার জন্য। কারণ আমি অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে তীরের সন্ধান খুঁজে পেয়েছি। এবার নোঙর করব। কিন্তু তুমি কি পেলে সুনীতদা? একটা মিথ্যা

মোহের পিছনে ঘুরে নিজের জীবনটাকে অপচয় করলে? জীবনের থ্রীল কি তুমি পেয়েছো?

বোধ হয় না। সুনীত বলল শেষ থ্রীল এখনও বাকী বোধ করি তোমার জন্য।

বাঁকা হাসি হেসে ললিতা বলল আমার জন্য কেন?

তোমাকে আমি সুখী দেখতে চেয়েছিলাম। হয়ত তাই।

এ ও তোমার আর এক আত্ম প্রবঞ্চনা। কিন্তু থ্রীল জীবনের চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে সুনীতদা। তাকে খুঁজে নিতে হয়। শুধু যে গতির মধ্যেই থ্রীল তাই নয়। যতির মধ্যেও থ্রীল আছে।

উদাস কণ্ঠে সুনীত বলল বোধহয় তুমি যা বলছ তাই ঠিক। এতদিন পরে আজ আমি সহসা উপলব্ধী করছি হিসেবে কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে। ককতগুলো অবিচার আমরা সচরাচর করে থাকি যার ক্ষমা নেই। তবু, তোমার প্রতি আমি যে অবিচার করেছি তার জন্য আজ সত্যিই ক্ষমা চাইছি।

প্রীতম যেন কি কাজে বেরিয়েছিল। শ্রীলা কাজের অছিলায় ভেতরে চলে গিয়েছিল। দুজনে একসঙ্গে ঘরে ঢুকল। শ্রীলা বলল এসো ছোড়দা, তোমার সঙ্গে পরিচয় করে দিই, ইনি প্রীতম সিং ললিতার ভাবী স্বামী—

সুনীত যন্ত্রচালিতের মত নমস্কারের জন্য হাত কপালে তুলল।

অঘটনটা ঘটল তার পরদিন। ২৯শে ফাল্গুন। শ্রীলা আর নিখিলেশের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর দিন। অনিন্দর গাড়ীতে শ্রীলার বাসায় আসছিল সুধন্য। অনিন্দ সুধন্যর সহকর্মী এবং বন্ধু। শ্রীলাদের বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী। শ্রীলার বিয়ের সময় অনিন্দ হায়দ্রাবাদে ট্রেনিং-এ ছিল। শ্রীলা তাই বার বার সুধন্যকে টেলিফোন করে বলেছিল অনিন্দ যেন নিশ্চয়ই আসে। অনিন্দ নিজেই ড্রাইভ করছিল গাড়ী। তখন বিকেল। ট্রাঙ্গুলার পার্কে

শুধু কয়েকটা প্যারাম্বলেটর ছড়ানো। দোলনায় কয়েকটা বাচ্চা মনের আনন্দে দুলছে। ঈষৎ বড়রা লনের ওপর বসে গল্প করছে। ক্যাম্বিসের বল নিয়ে কিশোররা এখন ভীড় জমায়নি। সহসা পার্কের রেলিং ঘেঁসে গাড়ী থামিয়ে অনিন্দ জিগ্যেস করল ওই ভদ্রলোককে চিনিস ?

কোন ভদ্রলোক ?

ওই যে গুলমোহরের তলায় শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে ?

পার্কের এককোণে গুলমোহর গাছের তলায় অলস ভঙ্গীতে শায়িত একজন ভদ্রলোকের দিকে সুধন্যর দৃষ্টি আকর্ষণ করল অনিন্দ।

সুধন্য অবাক হল এবং বিচলিতও হল সঙ্গে সঙ্গে। ভদ্রলোক নিখিলেশ।

কেন বল্ তো, সুধন্য জিগ্যেস করল।

ভদ্রলোকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কিসের জন্য।

আমার বর্তমান চাকরীটা বলতে গেলে উনিই আমাকে দান করেছেন। সুধন্যর বুক থেকে যেন একটা পাষাণ ভার গড়িয়ে নেমে যেতে যেতে সহসা থমকে গেল। অর্থাৎ ?

অনিন্দ বলল আবার অর্থাৎ ও"রই দাক্ষিণ্যে চাকরীটা পেয়েছিলাম। নইলে পাওয়ার কোন কথাই ছিল না।

সুধন্য একটু বিরক্ত হল। বলল পরিস্কার করে বল তো ব্যাপারটা কি ?

ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ। চাকরীটার ইণ্টারভিউ-এ আমরা উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম পরস্পরের। তখন কি জানতাম যে আমি এবং এম. এতে অবিশ্বাস্য মার্ক পাওয়া ছাত্র নিখিলেশ গুপ্ত একই চাকরীর জন্য প্রার্থী। ইণ্টারভিউতেও উনিই প্রথম হয়েছিলেন। সিলেকসন বোর্ডও অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। এবং এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট

লেটারও ওঁকেই দেওয়ার কথা। ইণ্টারভিউ হল থেকে বেরিয়ে দুজনে একই বাসষ্টপে দাঁড়ালাম। একটু হাসলামও। উনি কাছে এগিয়ে এসে বললেন ইণ্টারভিউ কেমন হল ?

আমি বললাম আপনিও candidate একথা জানালে আমি apply করতাম না। শুনলাম ইণ্টারভিউতে আপনিই ফার্ষ্ট হয়েছেন। আমি সেকেণ্ড।

অন্যমনস্ক ভাবে ভদ্রলোক বললেন জানি। কিন্তু চাকরীটা আপনিই পাবেন।

কেন ?

পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই ঘটে যার কোন কারণ থাকে না, —ওর শেষ কথাটা শুনতে পেলাম না। কারণ উনি তখন বাসে উঠে পড়েছেন। পরে যথারিতী আমিই এ্যাপোয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেলাম। চাকরীতে জয়েন করার পর পার্সোন্যাল ফাইল থেকে আসল ব্যাপারটা জানতে পারলাম। উনি appointment accept করেননি। এবং না করার কারণটা পেয়েছিলাম অনেক পরে। উনি নাকি একটা ষ্টেট স্কলারশিপ জোগাড় করবার চেষ্টা করছেন। বিদেশে গিয়ে কিছু রিসার্চ করবার। কারণ দেশকে উনি কিছু দিয়ে যেতে চান।

সুধন্য রুদ্ধ বিশ্বাসে শুনছিল। শেষে জিগ্যেস করল এখন উনি কি করেন জানিস ?

অনিন্দ ঘাড় নাড়ল। জানি না। জানি না উনি ষ্টেট স্কলারশিপ পেয়েছেন কি না। সম্ভবতঃ না পাওয়ারই কথা। কারণ যোগ্যরাই অধিকাংশ সময়ে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। তবে শুনেছি উনি এখনও চেষ্টা করছেন। এ্যম্বাসি এ্যম্বাসিতে ঘুরছেন। poor fellow.

চল যাওয়া যাক সুধন্য বলল।

ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করে আসব। আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ অন্ততঃ এটুকু জানিয়ে আসব।

সুধন্য অনিন্দর হাত ধরে বলল না, অনিন্দ যেও না।

অনিন্দ বিস্মিত হল। কেন?

সুধন্য শুধু বলল কারণ আছে।

অনিন্দ গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

তখনও উৎসব জমে ওঠেনি, সুধন্য আর অনিন্দ যখন পৌঁছাল। নিমন্ত্রিতেরা সবে আসতে সুরু করেছেন। নেহাৎই ঘরোয়া উৎসব। বাইরের বলতে শুধু ললিতা, প্রীতম আর অনিন্দ। নিখিলেশের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রিত কেউ নেই। অনিন্দকে দেখে খুশি হল শ্রীলা। বসবার ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। জাপানী ফানুষ আর ক্রেপ পেপার দিয়ে। জয়পুরী ফুলদানীতে একটা করে বড় রজনীগন্ধার গুচ্ছ। দরজা জানালায় সুদৃশ্য পর্দা। তার মাঝে সবার আগে চোখে পড়ে বুককেসের ওপরে মনীষের উপহার দেওয়া সেই তাম্রশাসন—তার পাশে নিখিলেশ আর শ্রীলার একটা হাসিমুখ ফটোগ্রাফ।

শ্রীলা প্রজাপতির মত ছটফট করে বেড়াচ্ছিল। রাণী মাসীমা আর মেজবৌদি রাত্রির আহারের আয়োজনে ব্যস্ত। ললিতা আর প্রীতম মার্কেটে গেছে ফুল আনতে। নিখিলেশ এখনও আসেনি।

শ্রীলার রাগ হচ্ছিল। আশ্চর্য্য লোকটার কাণ্ড। আজ উৎসবের দিন। অফিস যাওয়ার সময় বারবার করে বলে দিয়েছে শ্রীলা যেন তাড়াতাড়ি ফেরে তবুও—

কিন্তু একটা দিন কি অফিস না গেলে চলত না? শ্রীলা বলেছিল সে কথা। নিখিলেশ কাজের অজুহাত দেখিয়েছিল। জরুরী কাজ।

কিন্তু এখনও আসছে না কেন লোকটা? অনিন্দ সোফায় বসে একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। সুধন্য বসেছিল চুপ করে। সুধন্য ভাবছিল কথাটা শ্রীলাকে বলবে কি না। সুধন্যর

মন সংশয় আর সন্দেহে দোদুল্যমান। সুধন্য একবার ভাবল থাক বলে আর কি হবে, এখন তো ফেরার উপায় নেই। তারপর ভাবল হয়ত সুধন্যর সন্দেহ অমূলক। নিখিলেশ সত্যিই চাকরী করে এ্যাম্বাসিতে। তারপর ভাবল তবু জেনে নিতে দোষ কি?

এইসব নানারকম ভেবে সুধন্য ঠিক করল কথটা শ্রীলাকে বলবে।

সুধন্য শ্রীলাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। নিখিলেশ কোথায় রে?

এখন ও অফিস থেকে ফেরেনি। দেখ না লোকটার কাণ্ড, যাকে ঘিরে এই উৎসব, আয়োজন, তারই কোন পাত্তা নেই।

কিন্তু ওকি সত্যিই চাকরী করে?

মানে?

সুধন্য ওকে সব খুলে বলল। শ্রীলা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন ক্ষনিকের জন্য সরে গেল। মনের মধ্যে জমে ওঠা সন্দেহগুলো জোড়া দিতে লাগল শ্রীলা। নিখিলেশের কোন বন্ধু না থাকার কারণ, অফিসের ঠিকানা না জানানো ইত্যাদি। এবং অবশেষে শ্রীলা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে সব ভূয়া। নিখিলেশ একটি জাল জুয়াচুরীর মানুষ। শ্রীলা ঠোঁট কামড়ে কান্না রোধ করল। আজই ওদের বিবাহ বার্ষিকী।

আজ যেন কিছু বলিস নে সুধন্য বলল।

না মেজদা তা হয়না। দূর্ভাগ্য যদি এমনী ভাবেই নেমে আসে আমি তাকে মেনে নেব না। আক্ষেপ শুধু এই যে ও আমাকে মিথ্যে পরিচয় দিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে, ওর সঙ্গে আজই বোঝাপড়া করব। তোমাদের সামনেই কারণ আজের পর আর কাল নেই।

তখন নিখিলেশ হাসতে হাসতে টাইয়ের নট খুলছিল। ক্রকারী সেটটা টেবিলের ওপর নামাতে নামাতে মেজবৌদি বললেন ওদিকে একজন যে শয্যা নিয়েছে?

কেন নিখিলেশ জিজ্ঞাস করল।

মেজবৌদি মুচকি হেসে বললেন বিপ্রলব্ধার দুঃখ।

শ্রীলা বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। নিখিলেশ শ্রীলার পিঠে হাত রাখল। বিদ্যুৎ পৃষ্ঠের মত ওঠে বসল শ্রীলা।

একি শ্রীলা, তুমি কাঁদছ?

একটা কথা জিজ্ঞেস করব। সত্যি বলবে?

নিখিলেশ একটু থেমে বলল বলব।,

তুমি কি সত্যিই চাকরী করো?

না।

তাহলে আমাকে মিথ্যে বলেছিলে কেন?

বোধহয় তোমাকে পাবার জন্য।

কিন্তু এ মিথ্যে তো একদিন প্রকাশ হয়ে পড়তই।

হয়ত তার আগেই মিথ্যেটা সত্যি হয়ে উঠত। কিন্তু বর্ত্তমানে আমি অপরাধী।

এতদিন একথা গোপন রেখেছিলে কেন?

তুমি বিশ্বাস করো, আমি বার বার একথা বলবার জন্য সাহস সঞ্চয় করে তোমার কাছে এগিয়ে গেছি, কিন্তু তুমি বলতে দাওনি। দার্জিলিং-এ মোহের বশে তোমার কাছে মিথ্যে বলেছিলাম। বিয়ের আগে বার বার শোধরাতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি। তুমিই আমাকে বাধা দিয়েছ। বিয়ের পর আমি তোমার সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে গেছি। তখন আমার সব সাহস নিঃশেষিত। তখন আমার প্রতি মুহূর্তের ভয়, কখন তোমাকে হারাই।

আমি সব কিছু জানতে চাই।

আমিও সব কিছু বলতে চাই শ্রীলা। আমার সম্বন্ধে কি জেনেছ, কতটুকু জেনেছ আমি জানি না। আমি তোমার কাছে মিথ্যে বলেছি। আমি কোন চাকরি করি না। এই মিথ্যেটুকু ঢাকবার জন্য আমি অফিস যাওয়ার নাম করে পথে-পথে, পার্কে-পার্কে

ঘুরে কাটিয়েছি। এই এক বছর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সংসার চালিয়েছি। অবশ্য এজন্য আমার কোন অসাচ্ছল্য হয়নি। কিন্তু মনের দিক দিয়ে আমি ক্লান্ত। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আমি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছি। তুমি জিগ্যেস না করলেও আমি আজই তোমাকে সব কথা খুলে বলতাম।

শ্রীলা অকস্মাৎ গর্জে উঠল। মিথ্যে কথা। তুমি ঠগ, তুমি জোচ্চোর।

মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল নিখিলেশ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন রানী মাসীমা, শ্রীলা, অনিন্দ আর সুধন্য। রানী মাসীমা চীৎকার করে উঠলেন, আঃ শ্রীলা, কি ছেলেমানুষী হচ্ছে আজকার দিনে।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল শ্রীলা। ওগো, তোমরা দেখো, এই লোকটা আমাকে ঠকিয়েছে। এই মিথ্যুক, ঠগ, জোচ্চোর লোকটা।

রানী মাসীমার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল শ্রীলা। সুধন্য আর অনিন্দ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। মেজ বৌদি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

কাঁদতে কাঁদতে শ্রীলা বলল, মাসি, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল, আমি আর এক মুহূর্ত থাকতে পারব না।

শ্রীলার মাথায় হাত দিয়ে রানী মাসীমা বললেন, আঃ শ্রীলা, কি ছেলেমানুষী করছিস। ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু ভেবে দেখ, অন্তত আজকার দিনটা।

না মাসীমা, একজন ঠগ, জোচ্চোর, প্রতারকের ঘরণী হয়ে আমি এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে চাই না। তোমরা কি আমাকে নিয়ে যাবে?

এক মুহূর্তে উৎসবের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল। একে একে ঘর থেকে সব বেরিয়ে গেলেন। শ্রীলাকে নিয়ে গেলেন রানী মাসীমা আর মেজ বৌদি তারপর অনিন্দ আর সুধন্য। অনিন্দ

অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল। একটা অপরাধ বোধ ওকে কুশের মত বিঁধতে লাগল। যাওয়ার আগে আনিন্দ নিখিলেশের হাত ধরে বলল, আমাকে মার্জনা করবেন। আপনি আমার মহৎ উপকার করেছিলেন অথচ আশ্চর্য ঘটনাচক্র, আমি আপনার সবচেয়ে বড় ক্ষতির উপলক্ষ্য হলাম।

নিখিলেশ বলল, দুর্ভাগ্য যাদের পায়ে পায়ে ফেরে আমি সেই দলের। কি ভাবে যে নিজের এই বিড়ম্বিত ঠিকানাহীন জীবনের সঙ্গে শ্রীলার জীবনকে জড়িয়ে ফেললাম। এ ভালই হল। আপনি বৃথা আক্ষেপ করছেন অনিন্দবাবু। হয়ত সত্যি আপনি আমার উপকার করলেন। পরোক্ষে শ্রীলারও। শ্রীলাকে শুধু বলবেন, আমি তাকে ঠকাতে চাইনি।

দরজার কাছে সুধন্যও দাঁড়িয়েছিল, অথচ সুধন্যকে সরাসরি কোন কথা বলতে পারছিল না নিখিলেশ। একটা অপরাধ বোধ ওকে বাধা দিচ্ছিল বার বার। নিখিলেশ পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সুধন্যকে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন দাদা। আপনাদের সকলের কাছে আমি অপরাধী।

সুধন্যর সামনে তখন শ্রীলার অশ্রুসজল চোখ দুটো ভেসে উঠছিল। উদ্গত অশ্রু চেপে সুধন্য বলল, চল অনিন্দ।

ওরা বেরিয়ে গেল। নীল পাদ প্রদীপের সামনে নিভু নিভু আশার প্রদীপের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল তাম্রশাসনের সেই সুন্দর ও শাশ্বতের বাণী আর একজোড়া হাসি হাসি মুখ। ভোরের একরাশ জুঁই ফুলের মত।

দুঃখের দিনে সমব্যথীর অভাব হয় না। নিখরচায় সমবেদনা জানাতে এসে যারা অন্দরের নানান্ সংবাদ আহরণ করে নিয়ে যান ও অন্যত্র পরিবেশন করেন, ওমনি অনেক বিরক্তিকর মানুষের অনেক নিঃশুল্ক উপদেশ ও সমবেদনার বাণী শ্রীলাকে নীরবে সহ্য করতে

হল। সহ্য না করেও উপায় নেই। কারণ যাকে শ্রীলা পরিত্যাগ করে এসেছে সে শ্রীলারই নির্বাচিত। কাজেই নির্বাচনের ক্রটি শ্রীলারই। অতএব ফলাফলও শ্রীলাকেই ভোগ করতে হবে। তবে এখনও উপায় আছে। বললেন সেই শুভানুধায়ী বন্ধুরা। সিঁথীর সিঁন্দুর সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে ফেলা যায়। কিন্তু ফিরিয়ে আনা যায় না কৌমার্য। কারণ সেই দুরভিসন্ধি ও কপট বুদ্ধির নায়কের সঙ্গে এই দীর্ঘ বারোটি মাস সে একত্র বাস করেছে। একক শয্যায় শয়ন করেছে। সেই সাহচর্যের অনেক চিহ্ন রয়েছে শ্রীলার দেহে ও মনে। হয়ত সে সব কিছুই মুছে ফেলা যাবে না। কিন্তু অস্বীকার করা যাবে সেই সম্পর্কটাকে যার পরোয়ানা নিয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রী রূপে পরিচিত ছিল। আবার যুগ্ম জীবন-যাপন, সুখ দুঃখকে যুগ্মভাবে বরণ করবাব অঙ্গীকার, সব অস্বীকার করে নতুন জীবনের ছাড়পত্র নিতে হবে। অতএব আর কিছু না হোক, শ্রীলা অন্তত বিবাহ বিচ্ছেদের একটা কেস করতে পারে।

কিন্তু সব কিছু শুনে বিপক্ষে রায় দিলেন রানী মাসীমা। নারে ছোট, রানী মাসীমা বললেন, আমার মন সায় দিচ্ছে না। একদিনের ভালবাসাও মিথ্যে হয় না। একথা যদি মিথ্যে না হয় যে সে তোকে ভালবেসে ছিল, তাহলে সব সম্পর্ক কি শেষ করে দেওয়া যায়? ভেবে দেখ তুই।

না মাসীমা। শ্রীলা বলে, যে ভালবাসার সূচনা একটা মিথ্যার আশ্রয়ে, সে ভালবাসা নিখাদ হতে পারে না।

তবুও, রানী মাসীমা বললেন, তোদের চেয়ে আরও অনেক বড় বিরোধ রয়েছে আমার আর তোর মেশোমশাইয়ের মধ্যে। আমার অনেক বড় ক্ষতি করেছে সে। তোরা তো জানিস না, আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে আমার মা হবার সম্ভাবনাকে চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দিয়েছে। শঙ্কুর বয়স তখন দু বছর। তারপর তো কিছুই তোদের অজানা নয়। পাঁচ বছর বয়সে শঙ্কু মারা গেল। আমার

অতৃপ্ত মাতৃত্ব আমাকে কুশের মত বিঁধছে দিনরাত। কিন্তু আমি তো চিরকালের জন্য নিস্ফলা হয়ে গেছি। আজ সেই আত্মসুখ পরায়ণ লোকটিকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু ছাড়তে পারি না। আর বোধহয় ঘৃণা করি বলেই ভালবাসি।

শ্রীলা চুপ করে রইল। রানী মাসীমার কথা সাড়া জাগাল না ওর প্রাণে। এমন কি বিদেশিনী বড় বৌদির অমন সুন্দর চিঠিটাও শ্রীলার সিদ্ধান্তকে শিথিল করতে পারল না। তোমাদের বিয়ে একটা পবিত্র অনুষ্ঠান এবং কণ্ট্রাক্ট নয়, এই কথাই লিখেছিল বৌদি। আরও লিখেছিল অনুষ্ঠানের সময় উচ্চারিত মন্ত্রগুলি আর কিছুই নয়, শপথ। সুতরাং সে শপথ থেকে বিচ্যুত হতে গেলে একবার নয় বহুবার চিন্তা করা উচিত। কিন্তু একটা আপোষ কি একেবারেই সম্ভব নয় ?

না শ্রীলা জানিয়েছিল সম্ভব নয়। একজন প্রতারকের ঘরণী হয়ে প্রতিমুহূর্তে নিজের সন্দেহাকুল মনের ছোবল খেতে খেতে সে বেঁচে থাকতে রাজী নয়।

অতএব বিচ্ছেদের জন্য মামলা করাই এক মাত্র পথ। সেই পথই বেছে নিল শ্রীলা।

শ্রীলা যেদিন বিবাদ-বিচ্ছেদের জন্য কোর্টে আবেদন করল সেই দিন একই সঙ্গে তিনটে সংবাদ পেল। ষ্টেলা আর রবার্টসন কয়েক দিনের জন্য ভারতবর্ষে আসছে। তারা মনীশের কাছে থাকবে কিছুদিন। ষ্টেলা রবার্টসনের কাছে সব শুনেছে। ক্ষমা করেছে মনীশকে। ওর ত্যাগের কাছে মাথা নত করেছে। শ্রীলারও নতুন করে মনে হল সত্যিই মনীশ মহৎ। এমনী একটি লোকের মহত্বের ছায়ায় বোধ করি সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। শ্রীলাও আবেগে আপ্লুত হল। প্রেম ও বিচ্ছেদকে আপন করেছে মনীশ। দ্বিতীয় সংবাদ, ললিতা আর প্রীতম মুসৌরীতে বিয়ে করেছে।

এতেও অনেক আনন্দ পেল শ্রীলা। বোধকরি ললিতা এবার যোগ্য আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। বনের পাখী বন্দী হল সোনার পিঞ্জরে। তৃতীয় এবং শেষ সংবাদ মোটর সাইকেল র‍্যালীতে দিল্লী যাওয়ার পথে এক গভীর খাদের মধ্যে পড়ে গিয়ে সুনীতের মৃত্যু হয়েছে। জীবনের সব থ্রীল শেষ। সুনীতের মৃত্যুতে দারুণ আঘাত পেল শ্রীলা। কারণ সুনীতই ছিল শ্রীলার ভাই বন্ধু, ও শুভাকাঙ্খী। এক আশ্চর্য থ্রীলের নেশায় দুঃসাহসী নাবীকের মত প্রাণ দিল সুনীত।

দুঃখে শোকে শয্যা নিল শ্রীলা।

তারপর আদালতের নির্মম আদেশে কয়েকদিন সেখানে হাজিরা দেওয়া। হাজার জোড়া উৎসুক চোখের সামনে বিচারককে নিজের বক্তব্য নিবেদন করা। সেই পুরুষ ও নারীকে মানুষ অত্যন্ত করুণার চোখে দেখে যারা যে কোন কারনেই হোক পরস্পরের কাছে অব্যাহতি চায়। এই করুণার দৃষ্টিটাই শ্রীলার পীড়া দেয়। কিন্তু নিখিলেশ অনেক লজ্জার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে শ্রীলাকে। কোর্টের নোটিশ পেয়েও আসেনি নিখিলেশ। ম্যাজিষ্ট্রেট এক তরফা ডিগ্রী দিয়েছেন শ্রীলার পক্ষে। আজ শ্রীলা মুক্ত। শ্রীলা স্বাধীন। রায়ের নকলটা হাতে নিয়ে সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলো যেন মনের মধ্যে শেষ বারের মত দেখে নিল শ্রীলা। ভাবল আর কোনদিন এই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি গুলো বিভীষিকার মত তাড়া করে ফিরবে না, যন্ত্রনায় রক্তাক্ত করবে না ওকে, ব্যাথায় কাতর করে তুলবে না অহরহ। একটা ক্রুর প্রতিহিংসার ইচ্ছা সহসা জেগে উঠল শ্রীলার মনে। শ্রীলা মনে মনে ভাবল নিখিলেশের বাসায় গিয়ে ওর অবস্থাটা দেখে আসা যায় এবং সেই সঙ্গে নিখিলেশকেও জানিয়ে দেওয়া যায় মুক্তির আনন্দে শ্রীলা কতখানি তৃপ্ত। শ্রীলার সব কিছুই হারিয়ে দিয়েছিল নিখিলেশ। আসবাব পত্র, পোষাক আসাক, গয়না সব। কিন্তু কিছুই কি নেই? তারপর অকস্মাৎ শ্রীলার মনে

পড়ল, আছে। অন্ততঃ একটা জিনিস আছে যার ওপর নিখিলেশের কোন অধিকার নেই। মনীশের উপহার দেওয়া সেই তাম্রশাসন। সুন্দর ও শাশ্বতের বাণী। একজন হুরভিসন্ধির মানুষের বাড়ীতে এই মহৎ বাণী নিতান্তই বেমানান। ওটা ফেরৎ আনতে হবে। কোর্ট থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি ডাকল শ্রীলা। অনেকদিন নিখিলেশের কোন খবরই রাখেনি শ্রীলা। মাঝে কে যেন বলছিল যে নিখিলেশ এবার সত্যিই বিদেশে যাচ্ছে। যে মায়ামরীচের স্বপ্নে ওর জীবনে এই বিপর্য্যয়, এতদিনে সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। এ্যাম্বাসি থেকে একটা স্কলার্শিপ পেয়েছে নিখিলেশ। কিন্তু শ্রীলা কান দেয়নি। কি হবে আর পুরানো জীবনের কথা ভেবে যে জীবন শুকনো পাতার মত পায়ে দলে এসেছে ও। ট্যাক্সিতে বসে শ্রীলা ভাবল কিন্তু নিখিলেশ যদি সত্যিই চলে গিয়ে থাকে? তাহলে আর কি। তাহলে না হয় ফিরেই আসবে। ট্যাক্সি নিখিলেশের বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। ভাড়া মিটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে সোজাসুজি দোতালায় উঠে কলিং বেলটা টিপল শ্রীলা। একটা কম বয়সি ছেলে দরজা খুলে দিল। ছেলেটা বোধহয় কাজকর্ম করে দেয় নিখিলেশের। অনুমান করল শ্রীলা।

বাবু কোথায় রে?

ঐ ঘরে। শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিল ছেলেটা। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল শ্রীলা। নিখিলেশ খোলা-জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সমস্ত ঘর আগোছালো। বিছানার চাদরটা মাটিতে লুটাচ্ছে। ময়লা জামা কাপড় এক পাশে ভাঁজ করা। সিগারেটের টুকরায় এ্যাসট্রেটা উপছে পড়েছে। শ্রীলার গা গুলিয়ে এল।

শুনেছেন শ্রীলা ডাকল নিখিলেশকে।

নিখিলেশ পিছন ফিরে তাকাল। তারপর ম্লান হেসে বলল আমি জানতাম তুমি আসবে।

শ্রীলা দাঁতে দাঁত টিপে বলল না আমি ফিরে আসিনি। কোর্টের রায়টা কি আপনি জেনেছেন?

নিখিলেশ ক্লান্ত ভাবে বলল সে তো আমি আগেই জানি। তুমি আমার কাছ থেকে মুক্তি চেয়ে ছিলে তাই আমি কোর্টে গিয়ে আমার দাবী জানাই নি, কারণ তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

যত সব ছেঁদো কথা। শ্রীলা মনে মনে ভাবল কথার জাল বুনে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা।

কিন্তু আমি এসেছি আমার একটা জিনিস এখানে পড়ে রয়েছে সেটা নিতে।

আমি তো তোমার সব কিছু পাঠিয়ে দিয়েছি।

না, সব কিছু আপনি পাঠাননি। ফটোগ্রাফটা ষ্ট্যাণ্ড থেকে খুলে নিল তারপর বলল তাম্রশাসনটাও আমি নিয়ে যাব।

কিন্তু ওটা তো আমাদের দুজনকেই উপহৃত। ওর ওপর তো তোমার একার অধিকার নেই।

অধিকার ওই তাম্রশাসনটার ওপর নয়। অধিকার ওই মহৎ বাণীটার ওপর। সুন্দর ও শাশ্বতের বাণী আপনার মত কপট ও প্রতারকের বাড়ীতে মানায় না। অতএব আমি ওটা নিয়ে যাব।

শ্রীলার কথায় নিখিলেশ আহত হল। কিন্তু কথা বাড়াল না। শুধু ফোটো স্ট্যাণ্ড থেকে ফোটোটা খুলে রাখল। বাইরে ঝড় উঠেছে। পর্দাগুলো নৌকার পালের মত ফুলে ফুলে উঠছে। আকাশে মেঘ জমেছে। বোধহয় বৃষ্টি নামবে।

তাম্রশাসনটা একটা কাগজ দিয়ে মুড়তে মুড়তে নিখিলেশ বলল, লক্ষ্য করছি তোমার সম্বোধনটা বদলে গেছে। কোর্টের আদেশে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক তো শেষই হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা কি বন্ধু ভাবে থাকতে পারি না?

শ্রীলা শেষ ছোবলের জন্য তৈরী হয়ে বলল, বন্ধু বলে আপনাকে

ভাবতে পারলে স্বামী বলে ভাবতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু একজন প্রতারক imposter-কে আমি বন্ধুত্বের অযোগ্য বলে মনে করি। তাম্রশাসনটা দিন, আমি চলে যাই।

সে আঘাত সহ্য করেও নিখিলেশ বলল, শ্রীলা, তোমাকে আমার অনেক কিছুই বলার ছিল। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। সম্ভবত আর আমাদের দেখা হবে না। আমি সব কথা খুলে বললে হয়ত তুমি আমাকে ঘৃণা করতে না। তুমি কি একটু বসবে?

আমার সময় নেই। শ্রীলা বলল, বাইরে দুরন্ত হাওয়া। বৃষ্টিও নেমেছে।

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি।

তাই বলে কি আমি এখানে রয়ে যাব?

তাতেই বা আপত্তি কিসের। পূর্বেকার সম্পর্কের বিশ্বাসে কি একটা রাত এক বাড়ীতে বাস করা যায় না?

না, যায় না।

কিন্তু এই বৃষ্টিতে আমি তোমাকে যেতে দিতে পারি না।

আপনি কি আমাকে জোর করে আটকে রাখবেন?

সে জোর আমার কোথায় শ্রীলা। আমি তো ডানা ভাঙ্গা পাখী। আমি তোমাকে অনুনয় করতে পারি, মিনতি করতে পারি, কিন্তু জোর করার অধিকার তো আমার নেই।

তাম্রশাসনটা হাতে নিয়ে শ্রীলা বলল, চলি।

শ্রীলা যেও না, কথা রাখো। নিখিলেশের কণ্ঠের আকুতি শুনে মনে হল শুধু আজকার জন্যই নয়। চিরদিনের জন্যই শ্রীলাকে আগলে রাখতে চায় নিখিলেশ।

নিখিলেশের কথায় কর্ণপাত না করে শ্রীলা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। প্রচণ্ড বর্ষণে জল জমেছে রাস্তায়।

নিখিলেশও ওর পিছনে পিছনে এসেছিল। নিখিলেশ বলল, আর একটু অপেক্ষা করে যাও শ্রীলা।

শ্রীলা কোন জবাব না দিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল।

মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসল শ্রীলা আর নিখিলেশ। ঘরটার হতশ্রী অবস্থা দেখেও আজ মনে মনে কোন বেদনা বোধ করল না। অথচ কত নিপুণ ভাবে ঘরটাকে সাজাত শ্রীলা। সারাদিন ওর রুচি আর পছন্দ মাফিক আসবাবপত্র দেওয়ালের ছবি, ফুলের টব, এ্যাকুইরিয়াম সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত। এক জায়গাতে কোন জিনিস দীর্ঘদিন রাখতে ভাল লাগত না। এ্যাকুইরিয়ামটা প্রায়ই স্থান বদলাত। কখনও পেগ টেবিলের ওপরে, কখনও দেরাজের মাথায়। দেওয়ালের ছবিগুলো প্রায়ই এধার-ওধার করত শ্রীলা। কিছুতেই পছন্দ হত না। জানালা দিয়ে সূর্য্যের আলো ছবি-গুলোকে ঝলমলিয়ে না দিতে পারলে শ্রীলার মন ভরত না যার ফলে প্রায়শঃই এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়ালে কখনও সারি সারি, কখনও বা সিঁড়ির মত কখনও অত্যন্ত সন্তর্পণে আগোছাল ভাবে ছড়িয়ে রাখত।

এ্যাকুইরিয়ামটা কোথায় পড়ে আছে। ওর মধ্যে রাজ্যের ছেঁড়া কাগজ ভরা আছে। ছবিগুলোর ওপরে ময়লা জমেছে। বুককেসের ওপরে একটাও বই নেই। সব মাটিতে স্তুপাকার। কিন্তু শ্রীলা এই ঘর, এই আসবাবপত্রর প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করছে না। বরং মাঝে মাঝে সদ্য বিবাহোত্তর জীবনের সেই অলস আলাপ আর বিনিদ্র নিশি যাপনের সমারোহ যা এই ঘরের মধ্যে ঘটেছিল সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে আবার উঁকি মারতে লাগল।

শ্রীলা বিব্রত ও বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল।

বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ওরা মুখোমুখি। নিশ্চুপ। স্তব্ধতা ভেঙে নিখিলেশই বলল, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারোনি শ্রীলা।

আজ একথা অবান্তর।

অনেক অবান্তর কথাই তো আমরা বলি। কখনও প্রয়োজনে। কখনও অপ্রয়োজনে। আদালতের রায়ে আজ তো আমরা অনাত্মীয়। অনেক কথাই তো বলা হয়নি। অনেক কথা শোনাও হয়নি কারণ এত শীঘ্র আমরা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব একথা কেউই ভাবিনি। আজ যখন এসে পড়েছ, তখন কিছু বলে যাও, কিছু শুনে যাও।

কিছু জানার আমার কোন আগ্রহ নেই। কিছু বলতেও আমি অত্যন্ত নিস্পৃহ বোধ করছি। পুরাতন জীবনের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। এবার আমি যেতে চাই।

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। এখন আমি তোমাকে যেতে দিতে পারি না।

আপনার এই উৎকণ্ঠা অপ্রয়োজনীয়। আমি এখুনি যেতে চাই, এবং আমি যাবোই।

না, তোমার যাওয়া হবে না।

শ্রীলা ভীত বোধ করল। ওর মুখ ঈষৎ বিবর্ণ হল। হৃদস্পন্দন দ্রুততর হল। তবুও শ্রীলা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার কোন অধিকার আপনার নেই। তার প্রমাণ পত্র আমার হাতে।

স্বামী হিসাবে সে স্বাধীনতা আমি হারিয়েছি। কিন্তু মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি কর্তব্য করবার স্বাধীনতা তোমার হাতের ওই প্রমাণ পত্রের বলে হারিয়ে যায়নি। এই দুর্যোগের রাত্রিতে আমি তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না।

আপনি কি জোর করে ধরে রাখবেন ?

প্রয়োজন হলে জোর খাটাতে হবে বৈকি।

বেশ তাহলে জোর খাটান। শ্রীলার বুক টিপ টিপ করছিল। নাকের ডগায় ঘাম জমেছিল। উঠতে সাহস হচ্ছিল না তবু জোর করে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। নিখিলেশ দরজা আটকে দাঁড়াল।

যেও না শ্রীলা। কথা শোন।

আপনি সরে যান, নিখিলেশের হাত ধরে ঝাঁকুনী দিল শ্রীলা। দরজাটা খুলে গেল এবং শ্রীলা প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল। নিখিলেশ শক্ত মুঠিতে শ্রীলার হাত ধরে প্রায় জোর করে টেনে ওকে ঘরের মধ্যে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিল। শ্রীলা কথা বলতে পারল না। ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় সমস্ত শরীর শিরশির করতে লাগল। শ্রীলা হাঁপাতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বজ্রপাতের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেল।

শ্রীলার মনে হল সেই দুরভিসন্ধির মানুষ এবারে তার শেষ খেলা দেখাবে। এই দুর্যোগের রাত। ঘরে বাইরে আলো নেই। বৃষ্টি ও মেঘের শব্দে কিছু শোনা যায় না, এর মধ্যে বুঝি একটা বাঘের খাঁচার মধ্যে ও ঢুকে পড়েছে। প্রাণপণে চীৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। অন্ধকারে নিঃসাড়ে একটা জয়পুরী ফুলদানী হাতের মধ্যে নিয়ে রাখল শ্রীলা। মরে যাওয়ার আগে একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। মরে যাওয়া ছাড়া আর কি? নিখিলেশ পরপুরুষ বৈতো নয়। আজ যদি নিখিলেশ এই সুযোগে পুনরায় লাঞ্ছিত করে ওর নারীত্বকে, সে তো মরণেরই সমান। শ্রীলা চেয়ারে কাঠ হয়ে বসে রইল। না, কোন শব্দ নেই। নিখিলেশ আজ তাহলে সুযোগের সন্ধান করছে। হঠাৎ কোন অসাবধান মুহূর্তে হয়ত—সহসা কার পায়ে লেগে একটা টিপয় সশব্দে মাটিতে পড়ল। শ্রীলার মনে হল নিখিলেশ ওর দিকে এগিয়ে আসছে। শ্রীলা চীৎকার করে উঠল, সাবধান, আর এগোবেন না, আমার হাতে একটা ভারী জয়পুরী ফুলদানী আছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই আলো জ্বলে উঠল এবং পরম স্বস্তীর সঙ্গে শ্রীলা লক্ষ্য করল নিখিলেশ ওর থেকে অনেক দূরে কোণের দিকে একটা চেয়ারে বসে আছে। একটা বিড়াল জানালা টপকে পালাল যেটা টিপয়টাকে মাটিতে ফেলেছিল। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। নিখিলেশের প্রায় সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে।

এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টির ছাট, আমি কি তোমার সামনের চেয়ারে বসতে পারি।

বসুন, শ্রীলা বলল।

নিখিলেশ আবার শ্রীলার মুখোমুখি বসল।

নিখিলেশের ছোকরা চাকরটা ঘরে ঢুকল।

রাস্তায় এক কোমর জল দাঁড়িয়েছে। বাস ট্রাম ট্যাক্সি কিছুই চলছে না। সে জানাল।

শ্রীলা ভেঙে পড়ল। তাহলে কি হবে। নিখিলেশও চিন্তিত হল। আমি নিজেও অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করছি শ্রীলা। কিন্তু কোন উপায় নেই। আজ রাত্রিতে আমাদের একই বাড়ীতে থাকতে হবে।

নিখিলেশের সঙ্গে একই বাড়ীতে? অসম্ভব।

না। আমাকে যেতেই হবে।

শ্রীলা ছেলেমানুষী কর না। আমার এই বাড়ী এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কোন নির্জন দ্বীপে কোন তফাত নেই। অন্ততঃ আজকার রাতে। যানবাহন বন্ধ। রাস্তায় এক কোমর জল। বেরানোর কথা চিন্তা করা যায় না। • বরং এমন একটা উপায় বার কর যাতে আমরা দুজনেই একই বাড়ীতে রাতটা কাটাতে পারি।

শ্রীলা অসহায়ের মত এলিয়ে পড়ল চেয়ারে। রাত্রে খাবে তো? নিখিলেশ জিগ্যেস করল।

না, আমার খিদে নেই।

তুমি তাহলে বিছানাটা গুছিয়ে এখানেই শুয়ে পড়ো।

আর আপনি?

আমি ওই ঘরে চেয়ারে বসে কাটিয়ে দেব।

ভয়ার্ত কণ্ঠে শ্রীলা বলল দরজায় ছিটকিনি সব ঠিক আছে তো?

শ্রীলা নিখিলেশকে ভয় করছে। সেটুকু উপলব্ধি করে নিখিলেশ বলল আমি না হয় বললে সিঁড়ির ল্যানডিংটার ওপরে চেয়ার নিয়ে

বসে কাটিয়ে দেব। তুমি ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিও। চাকরটা নীচে ওদের একটা আড্ডা আছে সেখানে শুতে যাবে।

শ্রীলা যেন কি ভাবল' তারপর বলল না থাক। আপনি ও ঘরেই থাকুন।

ইতিমধ্যে আবার চাকরটা দুঘরে দুটো মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে গেছে। মোমের মৃদু আলোয় নিখিলেশ আর শ্রীলাকে যেন নির্বাক নিস্পন্দ দুটো বিষণ্ণ মোমের পুতুলের মত মনে হচ্ছিল। রাত বাড়ছে। নিখিলেশেরও খেতে ইচ্ছে করল না। ছোকরা চাকরটা খাওয়া দাওয়া করে নীচে নেমে গেল শোবার জন্য। নিখিলেশ বাইরের দরজা বন্ধ করে শ্রীলাকে বলল তোমার কি ভয় করছে?

শ্রীলা বলল ভয় করলেই বা উপায় কি? নিখিলেশ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল বার বার আমার কারণে তোমাকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত হতে হচ্ছে এজন্য আমি লজ্জিত।

শ্রীলা বলল ও কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আর লাভ কি। আমাদের পথ তো বাঁধা হয়ে গেছে। এখন সেই পথে চলাই ভালো। আমি ভাবব আমার জীবনে এই বারোটি মাস একটি দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের কাল।

নিখিলেশ বলল হয়ত তাই। কিন্তু আমি সেই এক বছরের ক্ষণিক স্মৃতি নিয়েই কাটিয়ে দেব সারাজীবন। কারণ আমার কাছে দিনগুলো দুঃস্বপ্নের নয়।

এর উত্তরে কয়েকটা কঠিন কথা নিখিলেশকে শোনাতে পারত শ্রীলা। কিন্তু নিখিলেশকে আর আঘাত করে কোন লাভ নেই। নিখিলেশ বোধ করি পাথর হয়ে গেছে। প্রতিপক্ষ যদি প্রতিবাদহীন প্রতিরোধহীন হয় তাহলে লড়াই করার আনন্দ কোথায়? তাছাড়া শ্রীলার রোষও অনেকটা পশমিত হয়ে এসেছিল। মনের মধ্যে অনির্বান আগুনের দাহটাও আর অনুভব করছিল না শ্রীলা। শ্রীলা ক্লান্ত বোধ করছিল। চাকরটা বিছানা

করে দিয়ে গেছে। শয্যা মাত্র একটি। নিখিলেশ একটা চেয়ারে পা রেখে আরেকটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল। শ্রীলা শোবার উদ্যোগ করে কি যেন ভেবে বলল আপনি খাবেন না ?

ক্লান্তস্বরে নিখিলেশ বলল খিদে নেই। শ্রীলা মাঝের দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনিটা তুলতে গিয়েও তুলল না। ভাবল একটা রাত যদি নিখিলেশকে ও বিশ্বাস করে ক্ষতি কি ? ওরা বর্তমানে অনাত্মীয় হলেও তো একদার স্বামি-স্ত্রী।

শ্রীলা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে হঠাৎ যেন একটা পুরোন দিনের আমেজ পেল শ্রীলা। বুকটা ব্যথায় টনটন করে উঠল। বালিশে নিখিলেশের চুলের গন্ধ। সমস্ত শয্যায় যেন একটা পুরুষালী আঘ্রান। শ্রীলার বুকটা সহসা শূন্য মনে হল। শরীরের কোষে কোষে একটা অস্থির যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল শ্রীলা। তারপর সেই সুখের মত ব্যাথার ভারে ধীরে ধীরে ঘুমের আমেজে চোখ দুটো জড়িয়ে এল। ওর তন্দ্রীত চেতনার মধ্যে শ্রীলার শরীর যেন কার উষ্ণ আশ্লেষের জন্য আকুল হয়ে উঠল। ওর মন যেন গুমরে উঠতে লাগল কিসের যন্ত্রণায়। তারপর মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে শ্রীলা যেন অনুভব করল কার নিশ্বাস ওর কপালে পড়ছে। কিন্তু তার কোন স্পর্শ নেই। কোন উত্তাপ নেই। শুধু অনুভব আছে শ্রীলার সারা দেহে মনে ছড়িয়ে।

ভোর বেলায় শ্রীলার ঘুম ভাঙ্গতেই একটা পরিচিত সকাল দেখল। জানালা দিয়ে এক ফালী নরম মিষ্টি আলো এসে বিছানার ওপর পড়েছে। প্রথমেই শ্রীলার খেয়াল হল কাল শোবার সময় ওর গায়ে কোন চাদর ছিল না। অথচ সকালে সর্বাঙ্গে শাল জড়ানো। মাঝের দরজাটা খুলে শ্রীলা দেখল নিখিলেশ চেয়ারের ওপর ঘুমুচ্ছে। হাতটা মাটিতে এলিয়ে পড়েছে। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে আছে। নিখিলেশই কাল এক সময় শালটা শ্রীলার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল। শ্রীলা নিখিলেশের ঘুম ভাঙ্গাল না।

শালটা আবার এনে নিখিলেশের গায়ে জড়িয়ে দিল। তারপর জানালার কাছে দাঁড়াল। সকালটা ভারী ভাল লাগছে। তাছাড়া আরও ভাল লাগল শ্রীলার এইজন্য যে নিখিলেশকে ও একটা রাতের জন্য বিশ্বাস করতে পেরেছে। কিছুক্ষণ পর চাকরটা এল। শ্রীলা মুখ হাত ধুয়ে আয়নার কাছে এসে একটু পরিপাটি হবার চেষ্টা করল। পাউডারের পাফ বুলোল হাল্কা। চুলটাকে ঠিক করে নিল। তারপর চাকরটাকে বাজার পাঠিয়ে কেটলিটা উনুনে চড়াল।

নিখিলেশ ঘুম থেকে উঠে শ্রীলাকে ওই অবস্থায় দেখে কিছুটা বিস্মিত হল। মুখহাত ধুয়ে এসে পুনরায় সেই চেয়ারে বসল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীলা এক হাতে ধূমায়িত চা ও অন্য হাতে জলখাবারের প্লেট নিখিলেশ সামনে নামিয়ে রাখল। নিজেও এক কাপ চা নিয়ে অন্য একটা চেয়ারে বসল। দুজনে নীরবে চা পান করল। তারপর শ্রীলা বলল এবার আমাকে যেতে হবে।

শ্রীলা উঠে দাঁড়াল। নিখিলেশও বিষণ্ণ চোখে তাকাল। তারপর বলল চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। হঠাৎ শ্রীলার মনে পড়ল ও তাম্রশাসনটা আনতে ভুলে গেছে।

তাম্রশাসনটা আনতে ভুলে গেছি। শ্রীলা বলল। নিখিলেশ বলল তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো ওই সুন্দর ও শাশ্বতের বাণী তোমার জীবনে আমি মিথ্যে করে দিয়েছি?

অবিশ্বাস করতে পারলে আমার জীবনে এই বিপর্য্যয় ঘটত কি।

নিখিলেশ ক্লান্ত, বিষণ্ণ পরাজিত সৈনিকের মত বলল শ্রীলা, তোমার কাছে আমি অনেক অপরাধ করেছি। অনেক মিথ্যে কথা বলেছি। কিন্তু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ, তোমাকে আমি ভালবাসি একথা মিথ্যে নয়। আমাদের প্রেমের নেপথ্যে হয়ত মিথ্যের আনাগোনা ছিল। সে অপরাধ আমার। কিন্তু তোমার প্রেমকে মর্য্যাদা দিতে আমি তোমাকে কোনদিন ছোট করিনি। আর সব মিথ্যে হলেও মিথ্যে নয় আমার ভালবাসা।

তোমার সুন্দর ও শাশ্বতের বাণী তোমার জীবনে সার্থক হোক শ্রীলা। কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।

এই মুহূর্তে নিখিলেশের চোখের দিকে তাকিয়ে শ্রীলার মনে হল এ চোখে কোন ছলনা নেই। পরম নির্ভরতার সঙ্গে শ্রীলা নিখিলেশের বুকে মুখ রেখে বলল, আমি তো তাই চেয়েছিলাম। কিন্তু একথা তুমি আমায় আগে বলনি কেন। আমি তো সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়ে এই সত্যিটুকু জানতে চেয়েছিলাম যে তুমি আমায় সত্যিই ভালবেসেছিলে।

নীচের তলার দারোয়ান ঘুম জড়িত চোখে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এর ওপরে ওদের এই অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সহসা সম্বিৎ ফিরলে নিখিলেশ আর শ্রীলা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

———